Registration No.: SO197407 of 2012-2013
বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

ত্রয়োদশ বর্ষ❖সংখ্যা ২❖জুন ২০২৩

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান (পঞ্চম পর্ব) ঃ

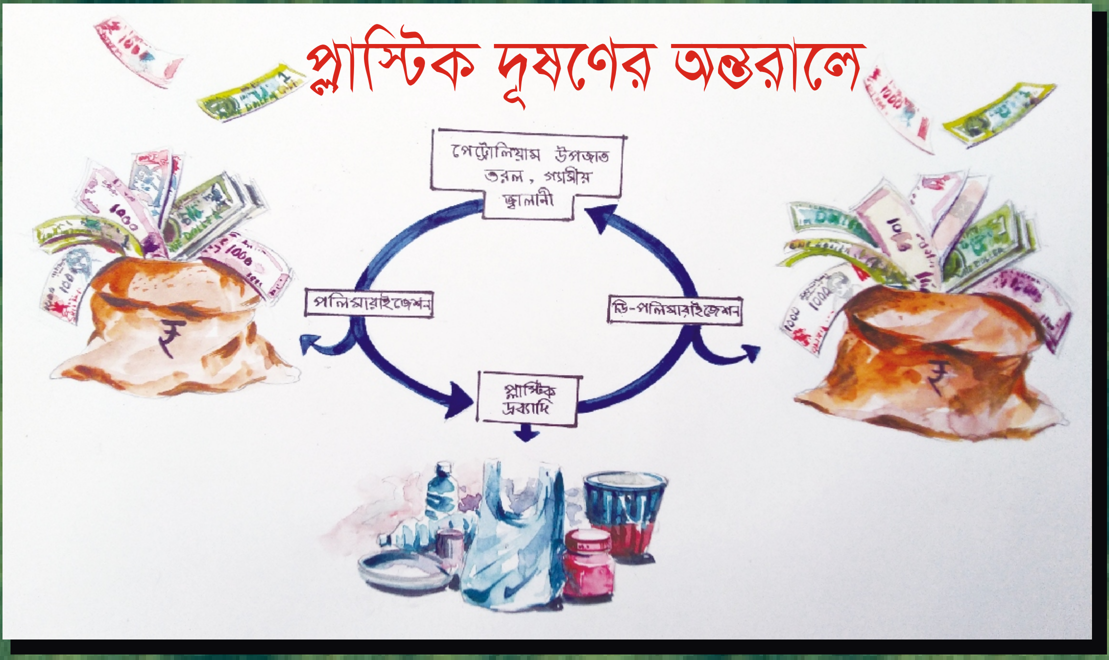
প্লাস্টিক দূষণের অন্তরালে
পেট্রোলিয়াম উপজাত তরল, গ্যাসীয় জ্বালানী
পলিমারাইজেশন
ডি-পলিমারাইজেশন
প্লাস্টিক দ্রব্যাদি

■সম্পাদকীয় ঃ ডারউইনবাদে ভয় কাদের?

■সমাজ দর্পণ ঃ ◆করমন্ডল রেল দুর্ঘটনা – যাত্রী সুরক্ষা এবং অপরাধীর খোঁজ
◆কুস্তিগীরদের আন্দোলন রাষ্ট্রের স্বরূপ উলঙ্গ করে দিল!

■অতিথি কলম ঃ চার্লস ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনবাদ

ত্রয়োদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০২৩

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ৪
- ◆করমন্ডল রেল দুর্ঘটনা ঃ যাত্রী সুরক্ষা এবং অপরাধীর খোঁজ
- ◆কুস্তিগীরদের আন্দোলন গণতন্ত্রের স্বরূপ উলঙ্গ করে দিল!

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান (পঞ্চম পর্ব) ঃ ১০
- ◆প্লাস্টিক দূষণের অন্তরালে

◈ অতিথি কলম ঃ ১৪
- ◆চার্লস ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনবাদ

◈ বিজ্ঞানের খবর ২২

◈ বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ২৪
- ◆ভারতে এবং বঙ্গভূমিতে আদিম মানুষের পদার্পণ

◈ পাঠকের কলম ঃ ২৬
- ◆ চোখ – আমাদের মনের জানালা
- ◆ নিকোলা টেসলা স্মরণে

◈ মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ ২৯
- ◆মানুষ কী করে প্রথম ব্ল্যাকহোলের খোঁজ পেল

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩০
- ◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সমীক্ষা ঃ ৩৩
- ◆সমীক্ষার শিক্ষা

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৪

◈ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের অগ্রগতি ৩৬

◈ কবিতা ঃ ৩৯
- ◆ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়া

সম্পাদকীয় ঃ

ডারউইনবাদে ভয় কাদের?

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা বোর্ড (সি.বি.এস.ই) দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য বইয়ের নতুন সংস্করণে ‘ডারউইনের বিবর্তনবাদ’কে ছেঁটে ফেলাতে বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে। এই ছাঁটাই কর্ম সম্পাদিত হয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনীং (এন.সি.ই.আর.টি) এর সুপারিশে। ইতিপূর্বে কোভিড অতিমারির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা কমানোর জন্য সিলেবাসের সংগতিবিধান করা হয়। তাতে যে অধ্যায়গুলিকে পরীক্ষার সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এখন তাকে নতুন মুদ্রিত বই থেকেই বাদ দেওয়া হল। দশম শ্রেণীতে কেবল বিবর্তনবাদকেই বাদ দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞান বিভাগের গণিতে বাদ গেছে বহুপদ রাশির বিভাজন, সম্পাদ্য, সমীকরণ সমাধানের বজ্রগুণন পদ্ধতি। রসায়নে পর্যায় সারণী বা periodic table এর মত বুনিয়াদি অধ্যায় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস পাঠক্রম থেকে ‘মোঘল ন্যায়ালয়’ (থীম-৯) সংক্রান্ত অধ্যায় বাদ দেওয়া নিয়ে। আরো বিতর্ক সৃষ্টি করেছে আগে ঘোষণা না করে সন্তপর্ণে ‘গুজরাত দাঙ্গা’র প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

স্বভাবতঃই বিতর্কের অভিমুখ – গণিত-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-জীব বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক – সেই বিষয়ে নিবদ্ধ না থেকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজনৈতিক যুক্তি ও প্রতিযুক্তিতে। পরিবর্তনের সমালোচকদের যুক্তি হল হিন্দুত্ববাদী আরএসএস এর মতাদর্শে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কৌশলে অপছন্দের বিষয়গুলিকে পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব প্রাপ্ত কমিটির অধিকাংশই কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিন্দু এডুকেশন ফাউন্ডেশন, ভেদিক ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত। সরকারী বলে বলিয়ান পরিবর্তনের কান্ডারিদের বক্তব্য হল ‘দ্বাদশ শ্রেণীতে তো ডারউইন পড়ানো হয়’, ‘মোঘলদের সম্পর্কে নিচের শ্রেণী থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বহু অধ্যায় এখনো বহাল আছে।’ এরপর ঐ মতাদর্শের অনুগামী মন্ত্রী-সান্ত্রী-রাজনৈতিক নেতা-শিক্ষাবিদ এমনকি ‘বৈজ্ঞানিক’ তথা বিজ্ঞান-গবেষণা সংস্থার কর্তা সমেত একটা গোটা ফৌজ ময়দানে নেমে পড়ে। তাদের বক্তব্য হল ‘পরিবর্তন করেছে তো বেশ করেছে। ভারত হল আদিকাল থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-গণতন্ত্রের জননী। বৈদিক ঋষিরা আধুনিক বিজ্ঞানের সব কিছুই আগে থেকে আবিষ্কার করেছেন। সেখান থেকেই গোটা বিশ্ব জ্ঞানার্জন করেছে। মধ্যে এক হাজার বছর বহিরাগতদের দাসত্ব বন্ধনে বিলুপ্ত গরিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে

হবে।’ এই প্রকার বিতর্ক নির্দিষ্ট বিষয়ের তাৎপর্যকে ধোঁয়াটে করে দেয়। ধোঁয়াটে পরিবেশ সত্যান্বেষন ও তার প্রচার দ্বারা সচেতন করে তোলার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটায়।

ডারউইন এর বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যাবে প্রায় দু’হাজার বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এক চিঠিতে এন.সি.ই.আর.টি’র কাছে উক্ত পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। চিঠিতে লেখা হয়েছে “... বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি বিষয় থেকে ছাত্রদের বঞ্চিত করা হলে তা হবে শিক্ষার নামে প্রহসন। ... বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদী বিশ্বদর্শন তৈরির স্বার্থে বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডারউইনের অক্লান্ত পর্যবেক্ষণ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি যেভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বে পৌঁছে দিয়েছিল, সেই কাহিনীও শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া এবং সপ্রশ্ন চিন্তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে।...”

বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। সাথে সাথে শিক্ষার্থী তথা বৃহত্তর সমাজে ‘বিবর্তনবাদ’ (যা ‘ডারউইনবাদ’ নামে পরিচিত) কে প্রতিষ্ঠা করতে চার্লস ডারউইনকে (এবং পরবর্তীকালে বিবর্তনবাদ এর সমর্থকদের) যে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে আজকের ডারউইন বিরোধের উৎস স্পষ্ট হবে না। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ডারউইন তাঁর বৈপ্লবিক পুস্তক ‘প্রজাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে’ [অন দ্য ওরিজিন অফ স্পিসিস] প্রকাশ করেন। সেই সময় তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। কিন্তু মাত্র ১২৫০ কপি প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার আগে তিনি প্রায় দু’দশক অপেক্ষা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ সিদ্ধান্ত যে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বিপুল বিরোধিতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। ডারউইনের তত্ত্ব কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃত্বের এবং রক্ষণশীল রাজনীতিকদের দ্বারাই সমালোচিত হয়নি। হার্সেল এর মত বিজ্ঞান ব্যক্তিত্ব আর জন স্টুয়ার্ট মিল এর মত চিন্তাবিদদের ব্যঙ্গ ও পরিহাসের মোকাবিলা করতে হয়েছে ডারউইনকে। এর কারণ হল বিবর্তনবাদ এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছেও ‘দৈব শক্তিই সকল সৃষ্টির জনক’ – এই ‘প্রতিষ্ঠিত সত্য’ ভিন্ন অন্য কোন প্রামান্য তত্ত্ব মজুত ছিল না। ডারউইন যাবতীয় কুয়াশা দূর করে তুলে ধরেন – প্রকৃতি জীবজগতের ওপর কীভাবে ক্রিয়া করে। প্রজাতির উদ্ভব এবং বিলুপ্তির কারণ কী। সুতরাং ডারউইনের তত্ত্ব কেবল খ্রিষ্টধর্মের বাইবেল বর্ণিত মনুষ্য সৃষ্টির তত্ত্বের বিরোধিতা করে না – বিরোধিতা করে পূর্ববর্তী ইহুদি ও পরবর্তী ইসলাম সহ প্রতিটি ধর্মে বর্ণিত তত্ত্বকে। ভারত ভূখন্ডে প্রচলিত সনাতন ধর্ম (যা বর্তমানে হিন্দু ধর্ম রূপে প্রচারিত) জীব ও মনুষ্য সৃষ্টির বিষয়ে পৃথক কিছু বলে না। হাল আমলে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা করার রাজনৈতিক উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বহু বিষয়ের মত ডারউইনবাদ’কেও আক্রমণের বিষয়বস্তু করে তুলেছে। বছর পাঁচেক আগেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং বলেছিলেন – ‘ডারউইনের বিবর্তনবাদ অপ্রমাণিত। তাই পরিত্যাজ্য। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কেউ বানর থেকে মানুষ হতে দেখেনি। অতএব স্কুল কলেজে এই তত্ত্ব পড়ানো উচিৎ নয়।’

ডারউইনকে নিয়ে বর্তমান বিতর্কের তুলনায় অনালোচিত দিকটিকেও সামনে নিয়ে আসা দরকার। সি.বি.এস.ই দ্বারা ‘মোঘল ইতিহাস-গুজরাত দাঙ্গা-বিবর্তনবাদ’ ইতাদি বিষয়বস্তুকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সি.পি.আই(এম) নেতৃত্বাধীন কেরালা সরকার পরিপূরক পুস্তক (যাতে ঐ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে) পড়ানো ও তার ওপর পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী দ্বারা ঘোষিত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেরালার খ্রিষ্টান ও মুসলমান ধর্মীয় সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত স্কুল কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। যদিও তাদের বিরোধিতা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ডারউইনবাদে। কেরল ক্যাথলিক বিশ্পস কনফারেন্স ঐ প্রস্তাবিত পরিপূরক পাঠ্যবইয়ের বিরুদ্ধে একই কারণে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বর্তমানে ইজরায়েল, তুরস্ক, সৌদি আরব, পাকিস্তান,ওমান এবং মিশরে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাষ্ট্রে এই মর্মে আইন পাশ করানো হয় যে মনুষ্য সৃষ্টি বিষয়ে বাইবেলে বর্ণিত তত্ত্বের বিরোধী কোন কিছু যেমন – বিবর্তনবাদ পড়ানো যাবে না। ২২ বর্ষীয় জন স্কোপ্সকে ঐ আইন উল্লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিচার প্রক্রিয়া সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে এবং তা প্রধানতঃ ‘বাইবেল বনাম ডারউইনের তত্ত্বে’র সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয়। শেষে স্কোপ্সকে আইন লঙ্ঘনের দায়ে ১০০ ডলার জরিমানা করা হয়। ঐ মামলার রায় যাই হোক বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের ‘পীঠস্থান’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজও এই বিবাদ জারি রাখা হয়েছে। ২০১৭ থেকে টেক্সাস, অ্যালাবামা, আরকানসাস, ফ্লোরিডা সহ আটটি রাষ্ট্রে যে শিক্ষকরা (ঈশ্বরকৃত) সৃষ্টি তত্ত্ব পড়াবেন তাদের আইনী সুরক্ষা দেবার সংস্থা লাগু করার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

কিন্তু অন্তর্বিরোধের দিকটি হল এই যে অতি আধুনিক বিজ্ঞান

●*শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন*

সমাজ দর্পণ ঃ

করমন্ডল রেল দুর্ঘটনা ঃ যাত্রী সুরক্ষা এবং অপরাধীর খোঁজ

ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে বাহানাগা বাজার স্টেশনে গত ২রা জুন এর রেল দুর্ঘটনা শত শত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল, কয়েক হাজার মানুষকে স্থায়ী/অস্থায়ীরূপে পঙ্গু করে দিল আর বহু হাজার পরিবারের বুকে চিরস্থায়ী ক্ষত চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সংবেদনশীল সমাজ এমন মর্মবিদারক দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠবে, সর্বশক্তি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে; গভীর অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে কারণ খুঁজে বার করবে এবং ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তির সামান্যতম সম্ভাবনাও যাতে না থাকে তার জন্য কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে – এমনটাই আশা করা উচিত। আধুনিক সমাজের পরিচালক-নিয়ন্ত্রকরূপে রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর দায়িত্ব বর্তায় তাৎক্ষণিক ও দূরগামী কর্তব্যগুলিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার।

কিন্তু এই ভয়ংকর দুর্ঘটনার পরে আমরা যা প্রত্যক্ষ করে চলেছি তা বিচার করে দেখা যে কোন সমাজ সচেতন মানুষের দায়িত্ব। সামগ্রিক বিষয় অনুধাবন করার জন্য দুর্ঘটনার আগের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা উচিৎ। কারণ ভারতীয় ভূখন্ডে রেলপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ইতিহাস ১৭০ বছরের বেশি এবং প্রতিদিন ঘটে চলা ছোটখাট দুর্ঘটনাকে ‘ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও’ (!) এই মাপের ভয়ংকর দুর্ঘটনাও দুর্লভ নয়।

ভারতীয় রেল

৭০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতীয় রেল পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম। ২২,০০০ যাত্রী গাড়ি ও ৮৫০০-র ওপর মালগাড়ি চলাচল করে। প্রতিদিন গড়ে ২.৩ কোটি মানুষ যাত্রীগাড়িতে যাতায়াত করেন। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য রেল এর হাতে রয়েছে ৭৭ হাজার প্যাসেঞ্জার কোচ, ৩ লাখের ওপর মালবাহী ওয়াগন এবং ১২,৭৫০ এর বেশি ইঞ্জিন।

রেল ইঞ্জিন, যাত্রিবাহী কোচ, চাকা ও অ্যাক্সেল তৈরির ফ্যাক্টরি, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকো শেড, ওয়ার্কশপ, রিপেয়ারিং শপ রয়েছে রেল এর হাতে। এর সাথে রয়েছে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশাসনিক ভবন-দপ্তর, স্কুল-হাসপাতাল, ট্রেনিং কেন্দ্র, প্রেক্ষাগৃহ, স্টেডিয়াম, কর্মী আবাসন ইত্যাদি।

সামগ্রিক দায়িত্ব নির্বাহ করার জন্য ভারতীয় রেল এর কর্মীসংখ্যা ১২ লাখ ৫০ হাজারের আশেপাশে।

ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতে বহু বেসরকারী কোম্পানি নিজ নিজ অঞ্চলে রেল পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করতো। যেমন বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে, গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে ইত্যাদি। ব্রিটিশ শাসনেই এদের মধ্যে বেশিরভাগ বড় কোম্পানি ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার দ্বারা অধিগৃহীত হয়। ১৯৫০-এর দশকে বর্তমানের আঞ্চলিক জোনে বিভক্ত ভারতীয় রেল পুনর্গঠিত হয়।

ভারত সরকারের রেল মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় রেল সম্পর্কে দেশের মানুষ কী আশা করতে পারেন? **সুলভে, সুরক্ষার সাথে সময়ানুবর্তিতা বজায় রেখে গণ পরিবহনের দায়িত্ব পারন করা। এমন আশা করা কি অলীক কল্পনা? এর উত্তর হয় একইসাথে –**

না এবং হ্যাঁ!

সংবিধান মোতাবেক ভারত হল – সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কোথাও লেখা নেই যে ব্যাপক জনগণের শ্রমে নির্মিত রাষ্ট্রীয় সম্পদ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে লাভজনক দরে জনগণের কাছে বিক্রি করে আরো লাভ কামাতে হবে। সংবিধান অনুসারে জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে হবে। সুতরাং উপরোক্ত আশা অলীক কল্পনা হতে পারে না।

কিন্তু আমরা যদি অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান চেতনা থেকে রোজগার – এর মতো রেল পরিবহনের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাই তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় উপরোক্ত আশা অলীক কল্পনা মাত্র। এখন কেবলমাত্র সুরক্ষার প্রশ্নটিকে বিচার করা যাক্।

ভারতীয় রেল দুর্ঘটনা এবং সুরক্ষা

ইদানিংকালে ভারতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার দিকে এক নজর –

সাল, তারিখ	ঘটনাস্থল	কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঘোষিত/ আনুমানিক মৃত্যু	কারণ
১. ১৯৮১, ৬ই জুন	বিহার	৮০০-২০০০	ঝড়ের মধ্যে ভিড় উপচে পড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ৭টা বগি লাইনচ্যুত হয়ে ব্রিজ থেকে গোমতী নদীতে পড়ে যায়।
২. ১৯৮৮, ৮ই জুলাই	কেরালা	১০০ –	ব্যাঙ্গালোর থেকে তিরুবনন্তপুরম গামী আইল্যান্ড এক্সপ্রেসের ১০টা বগি লাইনচ্যুত হয়ে পেরুমন ব্রিজ থেকে বর্ষায় উপচে পড়া অষ্টমুদি লেক এ পড়ে যায়।

৩. ১৯৯৫, ২০শে আগস্ট	ফিরোজাবাদ উত্তরপ্রদেশ	৩৫৮ –	কালিন্দী এক্সপ্রেসের পেছনে গিয়ে পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস ধাক্কা মারে। কারণ প্রথম গাড়িটি একটি নীলগাইকে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায়।
৪. ১৯৯৮ ২৬শে নভেম্বর	পাঞ্জাব খান্না	২১২ –	জম্মু-তাওয়াই শিয়ালদহ এক্সপ্রেস ও কালিন্দী এক্সপ্রেস এর মধ্যে সংঘর্ষ।
৫. ১৯৯৯, ২রা আগস্ট	গাইসাল পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্ত	৩০০ –	অবধ আসাম এক্সপ্রেস ও ব্রহ্মপুত্র মেল এর মধ্যে সংঘর্ষ। তিনটে লাইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। দুটি গাড়ি একই লাইনে চলছিল।
৬. ২০০৫ ২৯শে অক্টোবর	অন্ধ্রপ্রদেশ ভেলুগোন্ডা	১০০ –	বন্যার জলে রেল লাইন উপড়ে গিয়েছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন জলাধারের ধারে অবস্থিত ব্রিজ পার করতে গিয়ে লাইনচ্যুত হয়।
৭. ২০১০ ১৯শে জুলাই	পশ্চিমবঙ্গ সাঁইথিয়া	৬৬ –	প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বার হতে যাওয়া বনাঞ্চল এক্সপ্রেসের পেছনে ধাক্কা মারে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।
৮. ২০১১ ১০ই জুলাই	উত্তরপ্রদেশ ফতেপুর	৭০ –	হাওড়া-কালকা মেলের ১৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়।
৯. ২০১৬ ২০শে নভেম্বর	উত্তরপ্রদেশ কানপুর	১৫০ –	ইন্দোর-পাটনা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়।
১০. ২০১৮ অক্টোবর	অমৃতসর পাঞ্জাব	৫৯ –	রেল লাইনে জমায়েত হওয়া ভিড়ের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যায়। দশেরায় কুশপুতুল পোড়ানো দেখতে ভিড় জমা হয়েছিল।

এই উদাহরণগুলি হিমশৈলের চূড়া বললেও কম বলা হয়। কেবল দুটো পরিসংখ্যান দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ৯ মাসে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ৫২৬টা ঘটনা ঘটেছিল। ২০২১-এ রেল সংক্রান্ত ১৮০০০ দুর্ঘটনায় ১৬ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। [রেল লাইনে আত্মহত্যা ও এধরনের অন্যান্য ঘটনা এর মধ্যে সামিল আছে]

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রেল এর ভূমিকা

২০১৬-তে কানপুরের কাছে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে ২০১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দের কেন্দ্রীয় বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র রেল সুরক্ষার জন্য নিবেদিত এক ফান্ড বা কোষের সূচনা করে। যার নাম হল **রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষণ কোষ (আরআরএসকে)**। পরবর্তী পাঁচ বছরের সময়কালে **১ লক্ষ কোটি টাকার** ঐ কোষের প্রাথমিক রাশি দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের। অবশিষ্ট রাশি রেল তার নিজের আদায় করা রাজস্ব ও অন্যান্য উপায় থেকে সংগ্রহ করবে। প্রথম চারবছর পর্যায়ে ভারতীয় রেল ঐ কোষে তাদের দ্বারা দেয় রাশির ৭৮.৯% দেয়নি। আরআরএসকে-এর ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব হল সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কিত কাজ। রেল পথের পুনর্নবীকরণ তার মধ্যে পড়ে। এই খাতে বরাদ্দ করা অর্থ ক্রমাগত কমছে। যেমন ২০১৮-১৯-এ ৯৬০৭.৬৫ কোটি টাকা থেকে পরের বছর কমে হয়েছে ৭,৪১৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে প্রত্যেক বছর ঐ খাতে পাওয়া টাকা খরচ করতে না পেরে রেল ফেরৎ পাঠিয়েছে।

অথচ তথ্য দেখাচ্ছে ঐ চার বছরে ২০১৭টি রেল দুর্ঘটনার মধ্যে ১৩৯২টি অর্থাৎ ৬৯% এর কারণ হল – লাইনচ্যুত হওয়া। গুরুতর দুর্ঘটনা – যার ফলে প্রাণহানি হয় তার ৮০% এর কারণ হল লাইনচ্যুত হওয়া এবং সংঘর্ষ। লাইনচ্যুত হওয়া বা সংঘর্ষের মুখ্য উৎসগুলি হল রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের খামতি, রেল লাইনের বাঁক নির্ধারিত সীমার থেকে অধিক, পয়েন্ট সেট করার ক্ষেত্রে ভুল ইত্যাদি।

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) এর তদন্ত রিপোর্ট বলছে ঐ চারবছরে সুরক্ষার জন্য গঠিত কোষ এর টাকা খরচ করে কেনা হয়েছে আসবাসপত্র, শীতের জ্যাকেট, কম্পিউটার, এক্সক্যালেটর, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পা ম্যাসাজ করার যন্ত্র। খরচ করা হয়েছে বাগান-পায়খানা তৈরিতে, বেতন ও বোনাস দিতে এমনকি ঝান্ডা তোলার জন্য। অন্য প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বর্তমানে দেশজুড়ে যে হাইস্পিড ট্রেন 'বন্দে ভারত' চলছে তা কি ভারতীয় রেলের বর্তমান পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? রেলের অধিকাংশ কর্মী এবং আধিকারিকদের মতে তা নয়। তবুও চলছে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ফলাফল ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন।

সুতরাং এটা বলা অন্যায় হবে না যে ভারতীয় রেল এ দুর্ঘটনা – এক একটি 'ঘটনা' মাত্র। দ্বিতীয়তঃ রেল এর ক্ষেত্রে সুরক্ষা পেছনের সারিতে পড়ে থাকা একটি বিষয়।

করমন্ডল দুর্ঘটনা এবং পরবর্তী ঘটনাক্রম

করমন্ডল ও যশবন্তপুর হাওড়া এক্সপ্রেস এর দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় শাসক ও বিরোধী দলের কাদা ছোড়াছুড়ি! তৎক্ষণাৎ সংলগ্ন এলাকার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েন উদ্ধার কাজে। উদ্ধারের জন্য ট্রেনীং প্রাপ্ত বাহিনী আসার আগেই নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। বিভিন্ন সূত্রের সংবাদ অনুযায়ী বহু সংখ্যায় মানুষের শবদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। অনেকের মতে নিহতের মোট সংখ্যা হাজারের কম নয়। সাধারণ কামরাগুলিতে অসংরক্ষিত যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সাথে সাথে মারা গিয়েছেন তাঁরা যে যাত্রী ছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং সরকারের দ্বারা পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যায় শিলমোহর পড়ে গেল। অধ্যায় শেষ। মৃত ২৮৮। অসংরক্ষিত দরিদ্র শ্রমজীবীরা 'মহাকাল' এর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হলেন।

আহতদের চিকিৎসা, নথিভুক্ত নিহতদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া এবং দ্রুততার সাথে রেলপথ সাফ করার প্রক্রিয়া চালানোর জরুরি কাজের সাথে সাথে শুরু হল রাজনেতাদের দুর্ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিভ্রমণ। ভিভিআইপি-দের নিরাপত্তায় চরম ব্যস্ত প্রশাসন ও বাহিনী। অন্য দিকে চালু হল অনুসন্ধান।

দোষী কে?

অনুসন্ধানের আগেই প্রথমে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে হাওড়াগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেসের শেষ তিন বগি লাইনচ্যুত হয়ে করমন্ডলের লাইনে এসে পড়ে। রেল প্রশাসন ও ব্যবস্থার পক্ষে এটাই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক। কিন্তু সেটা ধোপে টেঁকে নি। ঘটনার পরদিন দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী সুর চড়িয়ে বিবৃতি দেন – যারা জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না। দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে।

৪ঠা জুন সকাল বেলা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সিদ্ধান্ত ঘোষণার ঢংয়ে বলেন দুর্ঘটনার মূল কারণ ও অপরাধের নেপথ্যে কাদের হাত রয়েছে সে সব চিহ্নিত হয়ে গেছে। ইলেকট্রনিং ইন্টার লকিং এবং পয়েন্ট মেশিনে পরিবর্তন ঘটানোর জন্যই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি ঘটনার তদন্তভার অপরাধী ধরার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেন।

প্রতিটি রেল দুর্ঘটনার বিভাগীয় প্রধানরা (বিভিন্ন দপ্তরের) সাথে সাথে বিভাগীয় তদন্ত করেন ও 'জয়েন্ট গ্রাউন্ড রিপোর্ট' পেশ করেন। এছাড়া কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি স্বতন্ত্রভাবে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, কারণ নির্দিষ্ট করেন ও ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

এই রিপোর্ট আসার আগে সরকারী স্তরে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল রেল ব্যবস্থা ত্রুটিহীন। দুর্ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত রেল ব্যবস্থায় অপরাধীরা হস্তক্ষেপ করেছে। এই নির্দিষ্টকরণের কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে কি?

কেতাবি যুক্তি কি বলছে?

সংবাদপত্রে রেল এর সূত্রে যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নপ্রকার –

* ঘন্টায় ১২৮ কিলোমিটার পূর্ণ গতিতে করমন্ডল এক্সপ্রেস ছুটছিল মেন লাইন দিয়ে (কারণ ঐ লাইনে সিগন্যাল সবুজ ছিল)। কিন্তু স্টেশনের ঠিক আগে যেখানে লুপ লাইন বার হচ্ছে সেখানে পয়েন্ট(১) বিপরীতে (অর্থাৎ লুপ লাইনের দিকে) সেট করা ছিল। সেই কারণে ঐ এক্সপ্রেস পূর্ণগতিতে লুপ লাইনে ঢুকে পড়ে – যে লাইনে সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৩০ কিলোমিটার। এরপর করমন্ডল এক্সপ্রেস লুপ লাইনে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা আকরিক বোঝাই মালগাড়িতে ধাক্কা মারে। প্রায় সমস্ত বগি লাইনচ্যুত হয়। কয়েকটি বগি গিয়ে ধাক্কা মারে উল্টোদিকে হাওড়ামুখী যশবন্তপুর এক্সপ্রেসের শেষ তিনটি বগিকে।

* রেল চলাচলের জন্য বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটিক) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটি হল ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম। পয়েন্ট পরিবর্তন করার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ থাকে রিলে রুমে। স্টেশনে প্যানেল রুমে থাকে প্যানেল বোর্ড। এই প্যানেল বোর্ড দ্বারা রিলে রুমের যন্ত্রাংশ স্বয়ংক্রিয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ বোর্ড স্টেশন মাস্টার বা সহকারী স্টেশন মাষ্টার এর নিয়ন্ত্রণে থাকে। ঐ প্যানেল বোর্ড থেকেই বোঝা যায় মেন না লুপ – কোন লাইনে পয়েন্ট সেট হয়েছে। লুপ লাইনে পয়েন্ট সেট করা থাকলে মেন লাইনে ডিসট্যান্ট ও হোম (যাদের মধ্যে দুরত্ব ১ কিলোমিটার) দুটো সিগন্যালই লাল থাকবে। এ ক্ষেত্রে সিগন্যাল ও পয়েন্ট বিপরীতমুখী থাকলে সেটা প্যানেল বোর্ডে নিশ্চিতভাবে ধরা পড়বে।

* রিলে রুম সুরক্ষিত রাখার জন্য জোড়া তালাচাবির ব্যবস্থা থাকে। যার একটা থাকে সংশ্লিষ্ট সিগন্যাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর কাছে। অন্যটা থাকে স্টেশন মাষ্টারের কাছে। দুটো একসাথে না হলে রিলে রুম খোলা যায় না। রিলে রুম খুলে ইন্টারলক বিচ্ছিন্ন করলেই কেবলমাত্র এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যেখানে ত্রুটি থাকলেও তা প্যানেল বোর্ডে ধরা পড়বে না।

এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা হচ্ছে যে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

বাস্তব তথ্য কি বলে?

প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক প্রণালী বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বা ব্যবস্থার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে কার্যকরী হয়। বিভিন্ন কারণে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঘটতে পারে। যন্ত্রাংশে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। বাহ্যিক হস্তক্ষেপেও তা অকার্যকরী হতে পারে। সে জন্য মানুষের দ্বারা তার ওপর নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনে মেরামতির দরকার পড়ে।

রেলে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থাও তার বাইরে নয়।

দ্বিতীয়তঃ যে ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি থাকবে সে ক্ষেত্রে রেল চলাচল যাতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য বিকল্প

---

(১) পয়েন্ট হল সেই জায়গা যেখানে রেল লাইনের উপর চলমান গাড়ির লাইন পরিবর্তন করা হয়। এর জন্য একজোড়া রেললাইন ব্যবহার করা হয় যাকে সরানো যায়, একে টাংরেল বলে। আর যে রেললাইন জোড়া স্থির থাকে তাকে স্টক রেল বলে।

ম্যানুয়াল বা হাতে চালানো ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়। এটাই বাস্তব।

ঘটনার অনুপুঙ্খ রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ঐ স্টেশনের ঠিক আগে রেল গেটে কয়েকদিন ধরে সমস্যা চলছিল। তাই গেটের বুম পাল্টে স্বয়ংক্রিয় বুম বসানোর জন্য পদ্ধতি মাফিক ব্লক (সময় নেওয়া – যে সময় ঐ লাইনে গাড়ি চলবে না) নেওয়া হয়। করমন্ডল এক্সপ্রেস আসার অল্প আগে মেল লাইন থেকে আকরিক বোঝাই মালগাড়িকে হাতে লেখা সিগন্যাল দিয়ে (যেহেতু ইন্টারলকিং বিচ্ছিন্ন করে কাজ হচ্ছিল) লুপ লাইনে ধীরগতিতে নিয়ে আসা হয়। করমন্ডল আসার ঠিক আগের মুহূর্তে ইন্টারলকিং এর সাথে ব্যবস্থাটিকে আবার যুক্ত করা হয়। এরপর আর সম্ভবতঃ পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ ছিল না। বাস্তবে এভাবেই কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ির সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় ‘ব্লক’ পাওয়া দুষ্কর। ব্লক নেওয়ার জন্য গাড়ি মার খেলে শাস্তির মুখে পড়তে হয় বিভিন্ন স্তরের টেকনিক্যাল কর্মীদের।

আবার বাহানাগা বাজার স্টেশনে দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানদের করা জয়েন্ট গ্রাউন্ড রিপোর্টে একজন সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনীয়ার দাবি করেছেন ডেটা লগার যন্ত্রে পয়েন্টের কোন গোলমাল ধরা পড়ে নি। করমন্ডল নির্দিষ্ট পয়েন্টের আগেই লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার পর পয়েন্ট লুপ লাইনের দিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত সকল তথ্যই একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং ‘অপরাধী’ ধরে ফেলে শাস্তি দিলেও রেল যাত্রীদের সুরক্ষার সমস্যা মিটবে না। বরং ক্রমাগত বেড়ে চলবে। কারণ নীতিগতভাবে রেল কর্তৃপক্ষ অপরাধী আগে থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছে। রেল এর সুরক্ষা বিভাগ তথ্যের অধিকার আইনে জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছে ৫৭% রেল দুর্ঘটনার কারণ রেল কর্মীদের গাফিলতি!

সুরক্ষা বিভাগ এই উত্তর দেয়নি যে লক্ষ লক্ষ পদ বিলোপ করে দেওয়ার পরও বর্তমানে বিধিবদ্ধ পদের মধ্যে সুরক্ষা কর্মীদের ১.২৫ লক্ষ পদ খালি কেন? [যে পদের মধ্যে আসে লোকোপাইলট, গার্ড, স্টেশন মাস্টার, গ্যাং ম্যান] মোট ৩ লক্ষ ১২ হাজার পদ খালি কেন? কেন গার্ড ছাড়া মালগাড়ি চালানো হচ্ছে? কেন বিভিন্ন সুরক্ষা সম্বন্ধিত কাজগুলির অবাধ ঠিকাকরণ করা হচ্ছে? কেন কোটি কোটি মানুষ ভাঙা-চোরা, ব্যবহারের অযোগ্য কোচে যাতায়াত করবেন? এমন হাজার প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যাবে না।

অতএব ...

অতএব অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। সেটা বোঝেন বলেই বোধ হয় শয়ে শয়ে যাত্রী করমন্ডল আবার যাত্রা শুরুর আগে শঙ্কিত চিত্তে প্রণাম করে গাড়িতে উঠছেন।

আবার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে। সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের ঝড় উঠেছিল। দুর্ঘটনা কোন্ বার? শুক্রবার শুক্রবার! রেল পথের ধারে ভূয়ো মসজিদ দেখিয়ে প্রশ্ন করা হল ওখানে কারা? রেল কর্তৃপক্ষ তদন্ত শেষ করার আগেই সিবিআই পাঠিয়ে রেলকর্মীদের দেশদ্রোহী প্রমাণ করে জেলে ভরা ও হয়ত নিকট ভবিষ্যৎ।

সামগ্রিক ব্যবস্থাটা যদি দেশদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী খোঁজার জন্যই সক্রিয় থাকে তবে রেল এর যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টা নেহাতই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে না কি? এমন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের যাদের ৯০%ই নিম্নবিত্ত, দরিদ্র – মৃত্যু কি খুব বেশি গুরুত্ব পেতে পারে?■

●সম্পাদকীয়’র শেষাংশ

ডারউইনবাদে ভয় কাদের?

ও প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান মানব সমাজ জীব বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের কোন শাখাকেই অস্বীকার করতে পারে না। বরং তার ক্রমাগত বিকাশের ওপর ভর করতে বাধ্য হয়। সুতরাং জীববিজ্ঞানের মৌলিক দুই স্তম্ভ ‘বিবর্তনবাদ’ ও জেনেটিক্স (সুপ্রজননবিদ্যা) কেও স্বীকার করতে ও ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এও উল্লেখ্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ‘মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি’র চারটি তলা বিস্তৃত এক প্রদর্শনী কেবলমাত্র বিবর্তন ও জেনেটিক্স এর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমর্পিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান সমাজ, যাকে পুঁজিবাদী সমাজ রূপে পরিভাষিত করা হয়েছে – বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যরূপে এবং নতুন নতুন পণ্য পরিষেবা তৈরির হাতিয়াররূপে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এরূপ ব্যবহার মানব সমাজে সৃষ্টি করেছে একদিকে মুষ্টিমেয়র হাতে অপার সম্পদের স্তুপ অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-জীবিকা হীন! সম্ভাবতই প্রশ্ন ওঠে এজন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর বর্তমান ব্যবস্থার মালিক-শাসকদের পক্ষে দেওযা সম্ভব নয়। তাই তারা আশ্রয় করেছে ফেলে আসা যুগের দৈব আর অলৌকিক দর্শনকে। যে দর্শন নানা মোড়কে ‘সবই তাঁর সৃষ্টি’, ‘কর্মের ফল’, ‘বিধিলিপি অখন্ডনীয়’ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত প্রচার করে। এমন জীবন দর্শন দ্বারা ব্যাপক সমাজকে পঙ্গু ও নির্বিষ করে তোলার জন্য বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার মূলে আঘাত করতে হয়। আর ডারউইনের বিবর্তনবাদ দৈব এবং অলৌকিক দর্শনের মূলে আঘাত করে। সুতরাং ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকৃত সঞ্চালক হল ধর্মীয় আলখাল্লার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া বিদ্যমান সমাজের শাসক-মালিকশ্রেণী। অতএব বিজ্ঞানকর্মীদের কর্তব্য হল ব্যাপক জনসমাজে ডারউইনের মৌলিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে ডারউইনবাদের বিরোধিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরা।■

সমাজ দর্পণ ঃ

মহিলা কুস্তিগীরদের আন্দোলন গণতন্ত্রের স্বরূপ উলঙ্গ করে দিল!
অবিলম্বে দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই!

কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছে যে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এর স্লোগানকে আরও এগিয়ে দেশের নারীশক্তির ক্ষমতায়নের জন্য আগামী ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে সেনা-আধাসেনার কুচকাওয়াজ, ট্যাঙ্ক-ক্ষেপণাস্ত্র-যুদ্ধবিমান নিয়ে শৌর্য প্রদর্শন কিংবা বিভিন্ন ট্যাবলো ইত্যাদির রাশ থাকবে মহিলা বাহিনীর হাতে। এসব দেখে কারও মনে হতে পারে যে ভারতরাষ্ট্র নারীশক্তির উন্নতি ও নারীর মর্যাদাকে কত না অগ্রাধিকার দেয়!

কিন্তু এসব নাটক দিয়ে সত্যকে আড়াল করা যাবে না। খোদ রাজধানীর বুকে দেশের মহিলা কুস্তিগীরদের (যাদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জয়ী) উপর লাগাতার যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদরত-দের উপর পুলিশ-প্রশাসনের নির্মমভাবে লাথি-লাঠি চার্জ, বুটের নিচে অলিম্পিকে পদক জয়ীদের পিষে জামা কাপড় ছিঁড়ে পুলিশের জিপে তোলার দৃশ্য ভারতসহ বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে! দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে নিত্যদিন তাঁর 'মন কি বাত' শোনান অথচ দেশের 'বেটি'দের মন কি বাত' শোনার তো প্রশ্নই নেই, তাঁদের মনে বেদনা আজ রাষ্ট্রের বুটের তলায় দলিত!

গত জানুয়ারি ২০২৩-এ একজন নাবালিকাসহ পাঁচ-সাতজন মহিলা কুস্তিগীর ভারতের রেসলিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ব্রিজ ভূষণ সরণ সিং এবং তার চ্যালা-চামুন্ডাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনেন। অভিযোগকারীরা বলেন যে তাদের করা অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণও তাদের হাতে আছে। এই অভিযোগ ওঠার পর মহিলা কুস্তিগীরদের প্রতিবাদের সমর্থনে বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগাট, সামি মালিক সহ বহু পুরুষ ও মহিলা কুস্তিগীররা এগিয়ে আসেন এবং দিল্লীর যন্তর মন্তরে ধর্ণায় বসেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ পি টি ঊষা অভিযোগকারীদের কথা শোনেন এবং তদন্তের আশ্বাস দেন। সেই অনুযায়ী ৭ জনের একটি তদন্ত কমিটি ঘোষণা করা হয় যার মুখ্য হলেন প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ (আন্তর্জাতিক পদকজয়ী) মেরি কম। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন চার সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। মন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে অভিযোগকারীরা তখন তাদের অবস্থান তুলে নেন। যদিও এই কমিটির প্রতি তাঁদের কোন আস্থা ছিল না, কারণ ঐ কমিটিতে প্রতিবাদকারীদের কোন প্রতিনিধি ছিল না, বরং নিপীড়ণকারী সভাপতির আস্থাভাজন কুস্তিগীররা ছিল। ফলে চার সপ্তাহের বদলে বার সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও তদন্ত এগোয় না, কোন রিপোর্টও প্রকাশিত হয় না। প্রতিবাদকারীরা তাই এপ্রিল মাসে যন্তর মন্তরে পুনরায় ধর্ণায় বসেন। পুলিশ রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজ ভূষণ সরণ সিং এর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ (এফআইআর) টুকুও নেয় না। নানা জলঘোলার পর ২৪শে এপ্রিল জনতার ক্ষোভ দমনে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে পুলিশ ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ নেয়। ব্যস! এর অতিরিক্ত কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না বরং প্রতিবাদীদের প্রতিবাদ বানচাল করার জন্য পুলিশ-প্রশাসন-রাজনৈতিক মহল থেকে নানা উৎপীড়ণ শুরু হয়। এই পর্যায়ে বাহুবলী ব্রিজ ভূষণ সরণ সিং বিভিন্ন মিডিয়াতে বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে যান। কখনও বলেন – এরা টুকরে টুকরে গ্যাঙ, কখনও বলেন এসব বিরোধীদের চক্রান্ত, কখনও বলেন – এরা সব ফান্ডেড ষড়যন্ত্রকারী, কখনও বলেন এরা আসলে কিছু নিয়মে ক্ষুব্ধ তাই এসব প্রতিবাদ করছেন। এখন "গদী মিডিয়া" এবং সরকারী দলের আইটি সেল এই বাহুবলীর পক্ষে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

কে এই ব্রিজ ভূষণ? ইনি উত্তর প্রদেশের গন্ডা জেলা থেকে ছয়বার নির্বাচিত সাংসদ। একবার সমাজবাদী পার্টি এবং বাকি

পাঁচবার বিজেপি-র হয়ে জিতেছেন। যদিও তিনি বুক ঠুকে বলেন – তার কোন পার্টির দরকার নেই, পার্টিগুলির তাকে দরকার। বহুকাল ধরে নানা খুন-জখম-ধর্ষণের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। ইনি প্রকাশ্য মিডিয়ায় তার দ্বারা সংঘটিত একটি খুনের ঘটনা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। এই বাহুবলীর বিরুদ্ধে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকার্যে সামিল থাকারও অভিযোগ আছে। এতসব দেখেও পুলিশ-প্রশাসন, আইন-আদালত মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

গত ২৮শে মে পুলিশ যখন প্রতিবাদকারী মহিলা কুস্তিগীরদের চুলের মুঠি ধরে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে, টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করছে তখন ব্রিজভূষণ নতুন সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে মিডিয়ায় পোজ দিচ্ছে। এইসব দেখে দেশের আপামর প্রগতিশীল জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়লেও দেশের আইন, প্রশাসন, সরকার নির্বিকার! বিশ্বের 'বৃহত্তর গণতন্ত্রের' উলঙ্গ চেহারা তাই আবারও জনসমক্ষে উন্মোচিত হল!

ভারতের স্বনামধন্য এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট পি টি ঊষা অভিযোগকারী মহিলা কুস্তিগীরদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন – মহিলা কুস্তিগীরদের এই বিশৃঙ্খল অসহিষ্ণু আচরণ নাকি বিশ্বের দরবারে ভারতের মাথা হেঁট করে দিয়েছে! প্রখ্যাত বক্সার মেরি কম মুখে তালা চাবি দিয়ে রেখেছেন শুরু থেকে। প্রখ্যাত ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি মিডিয়াকে বলেছেন যাদের লড়াই তাদের করতে হবে আমাদের কিছু করার নেই। রাষ্ট্রের পোষ্য ও বশ্যরা তাদের কাজ করে চলেছেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকতে পারে না। দেশের সকল ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরাই যে তাদের মাথা রাষ্ট্রের কাছে বেচে দিয়েছে এমন নয়, বেশ কিছু খেলোয়াড় এবং বুদ্ধিজীবী, কৃষক আন্দোলনের নেতারা এই অমানবিক আচরণের বিরোধিতা করেছেন। প্রতিবাদী মহিলা কুস্তিগীররা যখন তাঁদের পরিশ্রমে অর্জিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকগুলি ক্ষোভে ও হতাশায় গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবার জন্য মনস্থির করেছেন তখন বহু মানুষ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশজুড়ে ছাত্র-যুব-গণতান্ত্রিক মানুষ এই নৃশংস বর্বরতার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন এবং দোষীদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তিদানের আওয়াজ তুলেছেন। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গও এই বর্বরোচিত কান্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে পরিপূর্ণভাবে সহমর্মিতা জানায় এবং অবিলম্বে নারী নির্যাতনকারী ও তাদের রক্ষকদের কঠোর শাস্তি দাবি করে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে নারী প্রশ্নে সামন্ত অভিজাততন্ত্রের সাথে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন ফারাক নেই। সামন্ত ব্যবস্থায় নারী ব্যক্তিগত উপভোগের সামগ্রি আর বুর্জোয়া সমাজে বাজারী পণ্য।

শুধু মহিলা কুস্তিগীর নয়, এদেশের প্রতিটি পেশায় নিযুক্ত নারী থেকে গৃহকাজে নিযুক্ত মহিলারা সকলেই নানা প্রকার যৌন নির্যাতন, হেনস্থা আর অপমানের শিকার হন প্রতিনিয়ত। দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদে, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মহিলারা থাকলেও যা হয়, না থাকলেও তাই। যুগ যুগ ধরে দেশবাসী এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করছেন।

শুধু এদেশেই নয়, 'গণতন্ত্রের পীঠস্থান' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জিমন্যাস্টিকে চারবারের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত তথা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী সিমন বাইলসকে অলিম্পিক টীমের ডাক্তার দ্বারা যৌন হেনস্থা প্রমাণ করে বুর্জোয়া সমাজে নারীদের অবস্থান কোথায়! যুগ যুগ ধরে বিশ্বের সর্বত্র সকল পেশার মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন চলছে। বিশেষ করে শিক্ষা, ক্রীড়া, কলা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নারীদের উপর যৌন নির্যাতন বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

কিন্তু এটা বস্তুর একদিককার ছবি। বস্তুর অপর দিকটাও আছে। এই পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে বহুদিন পূর্বেই জন্ম নিয়েছে সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি। এর ক্রমাগত বিকাশ সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতিরও জন্ম দিয়েছে। সমাজে ক্রীড়া-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-গবেষণার সর্বক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে চলেছেন পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মহিলাদের নিপীড়ণের বিরুদ্ধে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ সহযোগীরাও এগিয়ে আসছেন, প্রতিবাদী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন। এই ধারা নিশ্চিতভাবেই আরও জোরালো হবে। সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ দাসত্বের অবসানের পথ দেখায়। পুঁজিবাদের অবসানের মধ্য দিয়েই পুরুষের দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।■

তপ্ত রোদে পিঠ পুড়ে যায়
পিচ গলে যায় রাজপথে।
সাক্ষী'রা আজ সাক্ষী থাকে
গণতন্ত্র বলে কাকে!
ন্যায়ের দাবিতে লড়ছে যারা
তারাই খাচ্ছে লাঠি লাথি।
আর আসল যারা অপরাধী
ঘুরছে উঁচিয়ে বুকের ছাতি।
ন্যায্য দাবিতে লড়াই হলে
বিঘ্ন ঘটে শৃঙ্খলায়
গাড়ি গাড়ি পুলিশ আসে
টেনে হিঁচড়ে জেল ভরায়।
নীল গেরুয়া রিং এর মাঝে
শুধু পদক জয়ের লড়াই নয়
আজ অধিকার বুঝে নিতে
রাজ পথেই লড়তে হয় ॥

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান (পঞ্চম পর্ব) ঃ

প্লাস্টিক দূষণের অন্তরালে

আজকাল প্লাস্টিক কথাটির সাথে দূষণ শব্দটি এমনভাবে ওতপ্রোত হয়ে গেছে যে শব্দটির শুনলেই জনমানসে প্রথমেই পথে প্রান্তরে বা সমুদ্র তটে ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা কিছু নোংরা প্লাস্টিকের ছবি ভেসে ওঠে। চারিদিকে শুধু বরফ গলা জল আর তার মধ্যে ভাসমান একটা বরফের ঢিবির উপর অসহায় ভাবে আছে একটা মেরু ভল্লুক, বিশ্ব উষ্ণায়নের কাল্পনিক ভয়াবহতা বোঝাতে স্কুলের পরিবেশ বিদ্যার বইয়ের পাতায় এই পরিচিত ছবিটা শিশুমনে কি বৈজ্ঞানিক ধারণার জন্ম দেয়? আবার, বায়ু দূষণ বোঝাতে বইয়ের পাতায় দেখা যায় ধূ ধূ রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মাঝখানে কয়েকটি সারি সারি কারখানার ছবি যার চিমনি থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া। ছবির নীচে লেখা 'বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষণ'। অথচ, বিজ্ঞানের পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটা বর্ণহীন গ্যাস। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই পরিবেশকে এইভাবে কেন উপস্থাপিত করা হয়? শিক্ষা কর্মকর্তাদের এই বেপরোয়া প্রয়াস মানুষকে কি সত্যিই পরিবেশ সচেতন করে তোলে? পরিবেশের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে?

'পরিবেশ বিপন্ন' এই আওয়াজের অন্তরালে কি রয়েছে অন্য কোন খেলা? পরিবেশকে রক্ষা করতে বিশ্বব্যাপী জারী করা হয়েছে সতর্কতা। তাদের ভাষায় গ্লোবাল ইমার্জেন্সী অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী জরুরী অবস্থা। এবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে, বিশ্বকে প্লাস্টিক দূষণের হাত থেকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছে জাতিসঙ্ঘ। এই অবকাশে দেখে নেওয়া যাক প্লাস্টিক দূষণের স্বরূপটা আসলে কি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে সমস্ত আবিষ্কার মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে ও জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করেছে, প্লাস্টিক তথা পলিমারের আবিষ্কার তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। পাথর, কাঁচ, ধাতু ও কাঠের ব্যবহারকে ধীরে ধীরে পিছনে ফেলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম ও আধা-কৃত্রিম পলিমার তার জায়গা করে নিয়েছে প্রায় সর্বত্র। জানালা, দরজা, চেয়ার-টেবিল সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র, গাড়ীর টায়ার, খেলনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈজসপত্র, রঙ, ফিল্ম, ব্যাগ সর্বত্রই ঘটেছে এই পলিমারের নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ। আর হবে নাই বা কেন? প্রকৃতিজাত প্রথাগত দ্রব্যাদির তুলনায় প্লাস্টিক অনেক সস্তা, এর উৎপাদনশীলতা ও ব্যবহারিক সুবিধা অনেক বেশি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া কৃত্রিম পলিমারের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমা রীতিমতো ঘটনাবহুল।

পলিমার কি?

পলিমার হল, উচ্চ আনবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট যৌগ যার ক্ষুদ্র এককের নাম মোনোমার। 'পলি' কথাটির অর্থ হল বহু, আর 'মোনো' কথাটির অর্থ হল একক। অর্থাৎ, বহু সংখ্যক মোনোমার এককের রাসায়নিক সংযুক্তি বা সংশ্লেষণে গঠিত বৃহদাকার যৌগ অণুকে সাধারণত পলিমার বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইথিলিন নামক মোনোমার দিয়ে গঠিত পলিমার হল পলিইথিলিন, যার চলতি নাম পলিথিন। পিভিসি বা পলিভিনাইল ক্লোরাইডের মোনোমার হল ভিনাইল ক্লোরাইড। পলিমার অণু একই ধরনের মোনোমার দিয়ে গঠিত হলে তাকে বলা হয় হোমোপলিমার আর দুই বা ততোধিক ধরনের মোনোমার উপস্থিত থাকলে সেই পলিমারকে বলা হয় কো-পলিমার। পলিমারগুলি উৎসের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; ১) প্রাকৃতিক ২) কৃত্রিম ও ৩) আধা কৃত্রিম। প্রাকৃতিক পলিমার হল প্রকৃতিজাত যেমন সেলুলোজ, পশম, সিল্ক ইত্যাদি। কৃত্রিম পলিমার হল মনুষ্য নির্মিত। যেমন বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক যথা পলিথিন, পলিপ্রপিলিন, পলিস্টাইরিন, নাইলন, পিভিসি, টেফলন ইত্যাদি। প্রকৃতিজাত পলিমারকে ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে তৈরী করা হয় আধা কৃত্রিম পলিমার, যেমন নাইট্রোসেলুলোজ, ভালকানাইজড রাবার, সেলুলয়েড ইত্যাদি।

প্রকৃতি নিজেই হল বিচিত্র সব পলিমারের ভান্ডার। প্রাকৃতিক পলিমারগুলির ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম ও আনবিক গঠন জানার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার পথ চলা শুরু। তার উৎস প্রধানতঃ প্রাণীজ ও উদ্ভিদজ। উদ্ভিদ দেহের কান্ড, পাতা ইত্যাদির গঠনগত প্রধান উপাদান হল সেলুলোজ। বৃক্ষের কান্ডকে শুষ্ক করে কাঠ প্রস্তুত করা হয়, তাই কাঠের প্রধান উপাদান সেলুলোজ, যা কাঠকে কাঠিন্য প্রদান করে। উদ্ভিদকুল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে তা গ্লুকোজ জাতীয় মোনোমারগুলির জৈব-সংশ্লেষণের দ্বারা সৃষ্ট। উদ্ভিদ-জগত থেকে প্রাপ্ত শস্যাদি যেমন, চাল, ডাল, গম, বার্লি, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, আলু, বিভিন্ন শাক সবজি, ফলমূল, তৈলবীজ ইত্যাদিতে যে শর্করা (পলিস্যাকারাইড), প্রোটীন ও ফ্যাট জাতীয় উপাদান থাকে তার সবই প্রায় পলিমার। অন্যদিকে, প্রাণীজ প্রোটীন, প্রাণীজ ফ্যাট, নিউক্লিক অ্যাসিড এ সবই বিভিন্ন ধরনের পলিমার। মানুষসহ সমস্ত প্রাণীর শরীর কয়েক লক্ষ পলিমারের আধার। পলিস্যাকারাইড জাতীয় শর্করার মোনোমার

হল গ্লুকোজ, প্রোটিনের মোনোমার হল অ্যামিনো অ্যাসিড ও বৃহদাকার ফ্যাট অণুগুলি ফ্যাটি অ্যাসিড অণু দ্বারা গঠিত। কৃত্রিম পলিমারগুলির তুলনায় প্রাকৃতিক পলিমারগুলি গঠনগত ও উপাদানগত দিক দিয়ে অনেক বেশি জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ। কৃত্রিম পলিমারগুলি একটি বা দুটি মোনোমার দ্বারা গঠিত, কিন্তু প্রাকৃতিক পলিমারগুলির মোনোমার অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রোটীন অণুগুলিতে প্রায় কুড়ি প্রকারের অ্যামিনো অ্যাসিড মোনোমার থাকতে পারে।

প্রকৃতিতে পলিমার চক্র

প্রকৃতিতে অন্যান্য চক্রের মতো পলিমারের জৈব রাসায়নিক চক্র ঘটে চলেছে অবিরত। এই চক্র প্রকৃতির খাদ্য শৃঙ্খলের এইটি অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের পচনের সাথে সাথে পলিমার যৌগগুলির পচন হয়। এই পচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে প্রকৃতিতে বসবাস করা আণুবীক্ষণিক জীবাণুকুল। পচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে জীবাণুকূল নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করে, অন্যদিকে বৃহদাকার পলিমার অণুযৌগগুলিকে ক্ষুদ্র অণুতে ভেঙ্গে দেয় যা মাটির সাথে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মাটি থেকে এই পুষ্টি শোষিত হয়ে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে ও এই চক্রটি সম্পূর্ণ করে। মানুষসহ সমস্ত জীবজন্তু এই চক্রের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। খাদ্যের মাধ্যমে সমস্ত জীবজন্তু প্রকৃতি থেকে উদ্ভিজ ও প্রাণীজ পলিমার গ্রহণ ক'রে দেহস্থ পাচক রস ও উৎসেচকের সাহায্যে পলিমারগুলিকে মোনোমার ও ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত করে। আবার ঐ ক্ষুদ্র অণু বা মোনোমারগুলিকে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত করে জীব ও উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন ধরনের পলিমার সংশ্লেষিত করে। প্রত্যেক জীবজন্তুর দেহে পৃথকভাবে অগুন্তি পলিমারচক্র সর্বদা ঘটে চলেছে বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রোটিন ভাঙছে আবার গড়ছে, ফ্যাট ভাঙছে আবার গড়ছে। পলিমারের ভাঙ্গা গড়ার এই কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে কয়েক হাজার উৎসেচক। উৎসেচকগুলি ধর্মগতভাবে প্রোটিন, অর্থাৎ পলিমার। উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে এর সংখ্যা বেশি হয়। আনুবীক্ষণিক একটি ব্যাকটিরিয়ার কোষে প্রায় হাজারটি উৎসেচক থাকতে পারে। মানব শরীরে মোট উৎসেচকের সংখ্যা প্রায় ১৩০০। তা সত্ত্বেও সেলুলোজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পলিমারকে ভাঙ্গতে অক্ষম আমাদের মানব শরীর। কারণ, সেলুলোজকে ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক গরু, ছাগলের মতো শাকাহারী জীবের শরীরে উপস্থিত থাকলেও, মানুষের শরীরে প্রকৃতিগতভাবেই তা অনুপস্থিত। তাই, সেলুলোজ শাকাহারীদের কাছে খাদ্যবস্তু হলেও, মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়।

প্রাকৃতিক পলিমারের চক্র প্রাকৃতিকভাবে সম্পন্ন হলেও, কৃত্রিম পলিমারগুলি প্রাকৃতিক পলিমার চক্রে অনুপ্রেবশ করতে পারে না। এর কারণ, প্রকৃতিতে কৃত্রিম পলিমারের ভাঙ্গন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের উপস্থিতি এখনও সেইভাবে জানা যায়নি। কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক জলে দ্রবীভূত হয়না, বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়না, পৃথিবীর কোন জীব বা উদ্ভিদ দ্বারা এগুলি খাদ্যবস্তু হিসাবে গৃহীত হয় না। বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক খেকো জীবাণুর সন্ধান করছেন, তবে এখনও তেমন সাফল্য মেলেনি। এর ফলে মানুষের ব্যবহারের পর বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য হিসাবে প্রকৃতিতে জমা হতে থাকে ও দীর্ঘদিন অবিকৃত থেকে যায়। মাঠ, ময়দান, খাল, বিল, নদী, নালা-নর্দমা, সমুদ্রতট – বলতে গেলে এভারেস্টের চূড়া থেকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ পর্যন্ত আজ প্লাস্টিক দূষণের কবলে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যার প্রভাব অত্যন্ত করুণ। পানীয় জল ও খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে প্লাসটিকের ক্ষুদ্রকণা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্য বিপত্তি ঘটিয়ে চলেছে অবিরত। যার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সাংঘাতিক।

প্লাস্টিক ব্যবহারের সূচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত

সর্বপ্রথম যে প্লাস্টিকটি মানুষ তৈরী করে তার নাম নাইট্রোসেলুলোজ। সেটি ছিল একটি অর্দ্ধ-কৃত্রিম পলিমার। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সেলুলোজের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী পার্কস তৈরি করেন নাইট্রোসেলুলোজ। এর কিছুদিন পরেই নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে কর্পূরের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয় সেলুলয়েড। ফটোগ্রাফিক প্লেট ও সিনেমার ফিল্ম তৈরীর কাজে প্রচুর পরিমাণে সেলুলুয়েড ব্যবহার করা হত। বিংশ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকেই চলচিত্র শিল্পের রমরমা বাজারে সেলুলয়েডের অনুপ্রবেশ ঘটে। এরপর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বিকেল্যান্ড, ফেনল ও ফরম্যালডিহাইড থেকে ব্যাকেলাইট প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। প্রকৃত অর্থে এটাই হল মনুষ্য নির্মিত সর্বপ্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক। এটি তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম ও অধিক তাপ সহনশীলতা ধর্মের জন্য ব্যাকেলাইট অতি দ্রুত বিদুৎ শিল্পে জায়গা করে নেয়। রবার গাছের ঘন আঠা বা ল্যাটেক্স থেকে ছোটখাটো ব্যবহার্য্য সামগ্রী বানানো শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দী শেষভাগ থেকে। বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ও পরবর্তীকালে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা রাবারের গঠন নির্ণয় করতে সক্ষম হন। বিজ্ঞানী গুডইয়ার প্রাকৃতিক রাবারকে সাদা সীসা ও সালফারের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভালকানাইজড রাবার প্রস্তুত করেন যার ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক পলিমারের আণবিক গঠন আবিষ্কারের পর তার অনুকরণ করে একের পর এক প্লাস্টিক বাজারজাত হতে থাকে। পলিমার রসায়ন ক্ষেত্রে নিত্য নতুন গবেষণা পলিমারের ব্যবহারিক মানকে খুব দ্রুত উন্নত করে তোলে। প্রাত্যহিক জীবনে পলিমারের আবির্ভাব এক কথায় বৈপ্লবিক। বিজ্ঞানের জগতে এ এক অনন্য আবিষ্কার।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম পলিমারের লাগামছাড়া ব্যবহার ও উৎপাদনের সঠিকতা নিয়ে এক বিতর্ক শুরু হয়। কিন্তু, প্লাস্টিক

ব্যবহারের উপযোগিতা, উৎপাদনশীলতা ও স্বল্প ক্রয় মূল্যের ন্যায্য যুক্তি পরিবেশ প্রেমীদের যুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। প্লাস্টিক উৎপাদন ক্ষেত্রে ছোট বড় কোম্পানীর আবির্ভাব ঘটে যায় অতি দ্রুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সেনা বাহিনীতে ব্যাপক পরিমাণে প্লাস্টিকের ব্যবহার শুরু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁবু খাটানোর জন্য ত্রিপল, পোশাক, জুতো, বর্ম, হেলমেট ইত্যাদি কৃত্রিম পলিমারের তৈরী। আজকাল যুদ্ধাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, জেট প্লেন, বুলেটপ্রুফ পোশাক, এসবই পলিমারের দখলে। এর ফলে বিশ্বময় প্লাস্টিকের চাহিদা হল আকাশ ছোঁয়া। শুধু আমেরিকাতেই প্লাস্টিকের উৎপাদন ৩০০% বৃদ্ধি পায় এক ধাক্কায়। যুদ্ধ শেষ হলেও প্লাস্টিকের উৎপাদন হ্রাস পেল না বরং দেশে দেশে তা আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ, ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য এখন সাধারণ মানুষ। প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপযোগিতা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে উৎপাদক কোম্পানীগুলির তত্ত্বাবধানে দেশে দেশে প্রদর্শনী চালু করা হল। স্বাভাবিক কারণে মানুষ প্লাস্টিকের সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। বাজারে অন্যান্য প্লাস্টিক যেমন পলিথিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিপ্রপিলীন ইত্যাদির আগমন ঘটার সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে এমনকি গৃহস্থালীর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্লাস্টিক তার জায়গা করে নিল। আজ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক কৃত্রিম পলিমার প্রযুক্তিবিদ ব্যবসায়ীদের দখলে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের বিশ্বের মোট প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১.৫ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) মেট্রিক টন। বর্তমানে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুসারে প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪৫৭.৭৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন। যার ব্যবসায়িক আয়তন প্রায় ৪৩৯.২৮ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) মার্কিন ডলার। এর মধ্যে মাত্র ২০টি বহুজাতিক কোম্পানী প্রায় ৫৫% প্লাস্টিক উৎপাদন করে। এই বহুজাতিক কোম্পানীগুলির শাখা সংস্থা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বিস্তৃত। বিশ্বের তাবড় তাবড় তেল কোম্পানীগুলি যেমন, এক্সনমোবিল, ডাউ, সিনোপেক, হ্যানউল কর্পোরেশন ইত্যাদির দখলে রয়েছে বিশ্বের অধিকাংশ বাজার। তেল কোম্পানীগুলির আধিপত্যের প্রধান কারণ হল, প্লাস্টিক শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল অর্থাৎ মোনোমারগুলি (যেমন, ইথিলীন, প্রপিলীন, বিউটাডাইন ইত্যাদি) প্রধানত পেট্রোলিয়াম শিল্পের উপজাত।

প্লাস্টিক দূষণ ও তার প্রতিকার

পরিবেশে প্লাস্টিক দূষণ প্রথম নজরে আনেন একদল সমুদ্র বিজ্ঞানী। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঐ বিজ্ঞানীর দল সমুদ্রের নিচে গবেষণার কাজে গেলে প্রচুর পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য লক্ষ্য করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে দিকে দিকে পরিবেশবাদীদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে যারা বিশ্ব জুড়ে প্লাস্টিক বর্জনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। কিন্তু প্লাস্টিকের উৎপাদন, ব্যবহার ও দূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করার আওয়াজ ওঠে কিন্তু সেই সময় পুনর্ব্যবহারের কার্যকরী প্রযুক্তির অভাব থাকায় ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহার শিল্প ছিল অলাভজনক থাকায় শিল্পপতিদের তেমন উদ্যোগ ছিল না।

আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে। অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র মোটামুটি এইরকম ঃ

প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় তিন রকম প্রযুক্তির প্রচলন আছে; ১) প্রথাগত প্রযুক্তি, যার মধ্যে প্রধান হল যান্ত্রিক উপায়ে প্লাস্টিক মোল্ড করে পুনর্ব্যবহার করা, মুক্ত জায়গায় বর্জ্যকে পুড়িয়ে দেওয়া (যা বর্তমানে বন্ধ আছে) ও নীচু জমি প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে ভরাট করা। ২) নতুন প্রযুক্তি, যার মধ্যে প্রধান হল, পাইরোলাইসিস, প্লাস্টিক ব্লেন্ডিং ইত্যাদি ও ৩) জৈব রাসায়নিক

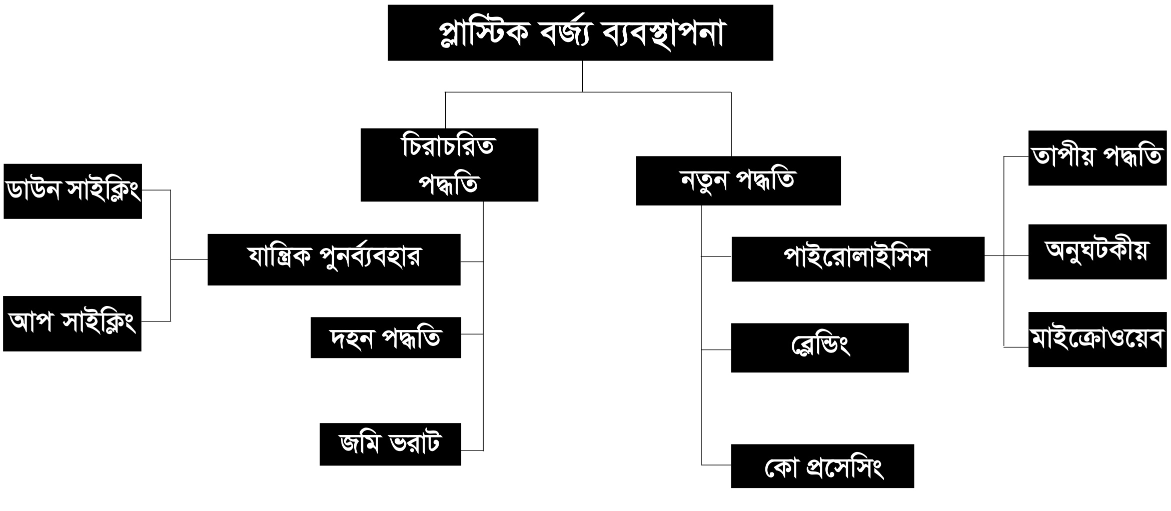

পদ্ধতি প্লাস্টিক খেকো জীবাণুর সাহায্যে প্লাস্টিককে অন্য প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত করা। সম্প্রতি গবেষকরা **ইডিওনেলা সাকাইনসিস** নামক একটি ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন যে জীবাণুটি এনজাইমের মাধ্যমে প্লাস্টিককে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে সক্ষম বলে জানা গেছে।

মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম পলিমারও প্রাকৃতিক চক্রের অন্তর্ভুক্ত

বহুকাল ধরে এটা বলা হয়ে আসছে যে, মনুষ্যসৃষ্ট পলিমার পচনশীল নয় বলে তা প্রাকৃতিক ভারসাম্যে নিদারুণভাবে আঘাত হানবে।

কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরের কেউ নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ। মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম পলিমারও প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট। প্রকৃতিতে চলা হাজারো প্রক্রিয়ায় এই কৃত্রিম পলিমারও প্রকৃতির অংশ হিসাবে ফিরে আসবে।

সম্প্রতি ভূবিজ্ঞানীদের দ্বারা সমুদ্রে জমা হওয়া এক বিশেষ ধরনের পলি নজরে এসেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে **প্লাস্টিগ্লোমেরেট** (Plastiglomerate)। সমুদ্রে বালি, কাঁকড় ও কাদার সাথে প্লাস্টিকচূর্ণ মিশ্রিত এক পলির স্তর। সমুদ্রের মধ্যে বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চলে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপের প্রবাহ (heat flow) বেশি এবং অগ্ন্যুৎপাত প্রবণ সেইসব অঞ্চলে এই ধরনের প্রস্তর সদৃশ পলি দেখা যাচ্ছে যেমন ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে।

সমুদ্রে সঞ্চিত প্লাস্টিক বা পলিমার কণাগুলি উচ্চতাপে সমুদ্রের পলিকে সহজে বেঁধে ফেলে এবং সেক্ষেত্রে অর্ধগলিত ঐ পলিমার সিমেন্ট হিসাবে কাজ করে।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন যে প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর প্রভৃতি অঞ্চলে সমুদ্রের পলিস্তর হিসাবে এই **প্লাস্টিগ্লোমেরেট** দেখা যাচ্ছে যা ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে কোয়াটারনারি যুগের একটি নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসাবে থেকে যাবে।

সমুদ্র গর্ভে প্লাস্টিগ্লোমেরেট এর উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম পলিমারের একটা অংশ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় (সামুদ্রিক অধঃক্ষেপণ) শিলাচক্রের (rock cycle) অংশে পরিণত হচ্ছে। এর অর্থ এই কৃত্রিম পলিমার পাললিক শিলায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। শিলাচক্রের নিয়ম অনুসারে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এই প্লাস্টিকসমৃদ্ধ পাললিক শিলা ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত শিলা এবং তারপর গুরুমন্ডলে গিয়ে ম্যাগমাতে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ প্রকৃতির উপাদানজাত কৃত্রিম পলিমার প্রকৃতিতে ফিরে যাবে।

সুতরাং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই প্লাস্টিক নিয়ে ছড়ানো প্রচারের জবাব দিচ্ছে।

বিশ্ব জোড়া ফাঁদ পাতা আছে

উপরে বর্ণিত প্রযুক্তিগুলির মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষতঃ পাইরোলাইসিস পদ্ধতি অত্যন্ত লাভজনক। এই প্রযুক্তিতে পলিমারকে বায়ুশূন্য স্থানে উচ্চ তাপ প্রয়োগে তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীতে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ, যে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে প্লাস্টিকের উৎপত্তি, প্লাস্টিককে সেই জীবাশ্ম জ্বালানীতে রূপান্তরিত করা। প্রথম পদ্ধতিটি হল পলিমারাইজেশন আর দ্বিতীয়টির নাম ডি-পলিমারাইজেশন। প্রথাগত যান্ত্রিক প্রযুক্তির চেয়ে পাইরোলাইসিস প্রযুক্তিগুলির ঝামেলা কম এবং অবিশ্বাস্যভাবে মুনাফাদায়ী হবার কারণে বিশ্ব জুড়ে এই ব্যবসায় সামিল হয়েছে বহুজাতিক কোম্পানীগুলি। যে কোম্পানীগুলি প্লাস্টিক উৎপাদনের ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে তারাই আবার বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ব্যবসা ফেঁদে মুনাফার পাহাড় তৈরী করছে। অত্যাধুনিক পাইরোলাইসিস প্রযুক্তিতে তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীর উৎপাদনশীলতা ৩০% থেকে ৯৫%। বেশ কিছু একচেটিয়া কোম্পানী প্লাস্টিক রিসাইক্লিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন কম্প্রেসার মেশিন, মোল্ডিং মেশিন, পাইরোলাইসি প্ল্যান্ট, মাইক্রোওয়েভ প্ল্যান্টের প্রযুক্তির ব্যবসায় নেমেছে বিশ্বজুড়ে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে শুধু মাত্র প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৩৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা হয়েছে। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ৪১.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই কোম্পানীগুলির স্বার্থে দেশে দেশে সরকারগুলি পরস্পর একত্রে চুক্তি ক'রে দূষণ আইন প্রণয়ন করে, তাদের কর্মসূচী রূপায়ণের পুরস্কার বাবদ পরিবেশবাদী সংস্থাগুলিকে লালন পালন করে, স্কুল কলেজে পরিবেশ বিদ্যার নাম ক'রে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ্যসূচী নিরূপণ করে। পরিবেশের সংজ্ঞা কি হবে, কত মাইক্রনের প্লাস্টিক পরিবেশ বান্ধব, প্লাস্টিক বর্জ্য কিভাবে নিজের বাড়িতে সংরক্ষণ করতে হবে, পরিবেশের বন্ধু কে, শত্রু কে এসব তারাই ঠিক করে দেয়। তাই বোঝাই যাচ্ছে, দূষণ সৃষ্টিকারী প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। এই কারণেই, প্লাস্টিক দূষণ প্রতিহত করার জন্য কোন দেশের সরকার বা পরিবেশবাদীরা প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করার বা নিয়ন্ত্রণ করার আওয়াজ তোলেন না। বরং, রাস্তা ঘাটে বা সমুদ্রতটে রাষ্ট্রনায়করা ঘুরে ঘুরে নিজেরা নোংরা প্লাস্টিক পরিস্কার করছেন এমন বিজ্ঞাপণ প্রায়ই চোখে পড়ে। কথাতে আছে 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে প্লাস্টিকের বালতি

কিছুদিন আগেও পথে ঘাটে কাগজ কুড়ানিদের দেখা যেত। সারা দিন ঘুরে ঘুরে রাস্তার চারপাশ থেকে লোহা-লক্কর কাগজ, ভাঙ্গা প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, পলিথিনের ব্যাগ, বাতিল হয়ে যাওয়া কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদি সংগ্রহ করে নামমাত্র পারিশ্রমিকে সেগুলো পৌঁছে দিত তার মালিকের কাছে। সেখান থেকে বিভিন্ন হাত ঘুরে প্লাস্টিকের সামগ্রীগুলি বাছাই করার পর পাঠিয়ে দেওয়া হত যান্ত্রিক রিসাইক্লিং-এর জন্য। এখন কাগজ কুড়ানিদের আর তেমন দেখা যায় না। পাইরোলাইসিস প্রযুক্তি চালু হবার পর থেকে প্লাস্টিক

➔

অতিথি কলম ঃ

চার্লস ডারউইন ও তাঁর বিবর্তনবাদ

– শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত জীব বিজ্ঞানী শ্রী শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের লিখিত গ্রন্থ 'প্রাণী ও প্রাণ ঃ সূচনা ও বিকাশ' এর তৃতীয় অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। এই গ্রন্থের এই অধ্যায়টি লেখকের অনুমতিক্রমে সংক্ষিপ্তকরণ ও অতি সামান্য পরিমাণে সম্পাদনা করা হয়েছে। বর্তমানে সি.বি.এস.ই-র দশম শ্রেণীর পাঠক্রম থেকে ডারউইনবাদ বাদ যাবার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের আধুনিক জীব বিজ্ঞানের গবেষণায় কিভাবে ডারউইন অপরিহার্য তার উপলব্ধি করতে এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এযাবৎকালে যত ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব-র কথা আমরা জানতে পেরেছি, সেখানে প্রায় ব্যতিক্রমহীন ভাবেই বলা আছে যে কোনো এক অতি-প্রাকৃত শক্তি, অন্যথায় ঈশ্বর, এই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় মতে, আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে যে প্রাণ-বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই, তার পুরোটাই ঈশ্বরের সৃষ্টি, হয়তো-বা আপন খেয়ালে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে প্রাণের যাবতীয় প্রকাশ তিনি একসঙ্গে রচনা করে বিশ্রামে গিয়েছেন। এই পৃথিবীতে শক্তির মতো প্রাণের আর সৃষ্টি বা লয় নেই। আর তাঁর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করে ঈশ্বরকে আর প্রাণের অন্য কোনো প্রকাশের কথা ভাবতে হয়নি – মানবজাতি নির্মাণের পর পরই তাঁর প্রাণ সৃষ্টির সৃজনশীলতা থেমে গেছে।

ডারউইন তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে প্রাণীজগতের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার সূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিরূপণ করেন, প্রাণের প্রেক্ষিতে জীবজগতে মানুষের অনন্য স্থানের ধারণা ধূলিসাৎ করেন। কিন্তু, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু ...। তাই নানা দিক থেকে এখন পর্যন্ত ডারউইনের তত্ত্ব যত বেশি বেশি করে প্রতিষ্ঠা ও মান্যতা পেয়েছে, মৌলবাদী ও অন্ধ যুক্তি সেই তত্ত্বকে তত বেশি বেশি করে নস্যাৎ করতে প্রয়াসী হয়েছে। আর এই দুই বিপরীত স্রোত আর বিরোধিতা ডারউইনের তত্ত্বকে পুষ্টির যোগান দিয়ে চলেছে আজও।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের জন মুরে প্রকাশনা সংস্থা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। বইটির শিরোনাম – On The Origin of Species by Means of Natural Selection, Or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. বইটির প্রকাশের তারিখ ২৪ নভেম্বর, ১৮৫৯; এই বইয়ের প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০২।

সেই সময়ের ইউরোপীয় সমাজে বাইবেল মতে সৃষ্টিতত্ত্বের যে প্রচলিত ধারণা ছিল, এই বইটি সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ নাকচ করে প্রানের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় তথ্যভিত্তিক এক তত্ত্বের প্রস্তাব রাখে। ডারউইন-এর কালে জেনোমিক্স, জিন, জেনেটিক্স, জীব-অণুবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের আধুনিক বিভাগ এবং তার থেকে উদ্ভূত ধারণাগুলির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে জীববিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই ধারণাগুলি যখন কার্যকর

➔

●প্লাস্টিক দূষণের অন্তরালে

সংগ্রহের ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কাগজ কুড়ানির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে পুরসভা, পঞ্চায়েত। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় প্লাস্টিক বর্জ্য আইন লাগু করে। ২০১৮ ও ২০২১ সালে দুবার সংশোধন করা এই আইনের বিস্তার পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত। এই আইন অনুসারে, শহরাঞ্চলে পুরসভা ও গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এলাকায় প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি দুটি করে প্লাস্টিকের বালতি বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। যার একটিতে পচনশীল বর্জ্য যেমন কাগজ, আনাজের খোসা ইত্যাদি ও অন্যটিতে অপচনশীল গার্হস্থ্য, বর্জ্য প্রধানত প্লাস্টিক সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পুরসভা বা পঞ্চায়েত দ্বারা নিযুক্ত এজেন্সি প্রত্যেক বাড়ি থেকে এই বর্জ্য সংগ্রহ করে ও সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা বিভিন্ন প্ল্যান্টে পৌঁছে দেয়। প্রত্যেক পুরসভায় এই রকম শত শত এজেন্সি গজিয়ে উঠেছে রাতারাতি। আইনে বলা হয়েছে, গার্হস্থ্য বর্জ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব ওই এজেন্সিগুলির। এই কাজে তারা ব্যর্থ হলে তার দায়ভার পুরসভা ও পঞ্চায়েতের উপরই বর্তায় কারণ এজেন্সিগুলি নিয়োগ করে তারাই। এই আইনে কিছু প্লাস্টিকের উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এর নজরদারি করার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের নয়, বরং প্রশাসনের। নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের উৎপাদন জারী থাকলে তা বাজারে আসবে, মানুষও ব্যবহার করবে। এর জন্য উৎপাদক মালিকের জরিমানা না করে সাধারণ মানুষকে দোষী করা বা জরিমানা করার অর্থ কী? পরিবেশ দূষণের দায়ে কোন মালিকের শাস্তি হবার ঘটনা কখনো শোনা যায় না। পরিবেশবাদী সহ সরকার পন্থী সংস্থাগুলি বিজ্ঞান তথা সত্যকে আড়াল করে। মানুষকে সচেতন হতে বলে মালিকদের মুনাফার স্বার্থে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় লাভজনক রিসাইক্লিং পদ্ধতির প্রধান কাঁচামাল পলিমারের সরবরাহক হল সাধারণ মানুষ। এই সত্য আজ প্রকাশিত। সমাজ যদি এর প্রতিদান দাবি করে তাহলে কি অন্যায় হবে?

বলে প্রমাণিত হয়, তখন এইসব আধুনিক ধারণার পটভূমিতে ডারউইনের মূল তত্ত্বের কোনো অংশই বর্জিত হয় নি; বরং ডারউইনের মূলতত্ত্বের ভিত্তিটি আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিজ্ঞানী হওয়ার তাগিদে তিনি ধৈর্য্য ধরে বছরের পর বছর বিভিন্ন গাছ এবং পশুপাখির নমুনা সংগ্রহ করেছেন, সংগ্রহ করেছেন জীবাশ্ম। সারা পৃথিবী থেকে, ভারত থেকেও, তিনি নিজের চেষ্টায় ৯০টি প্রজাতির পোষা পায়রা সংগ্রহ করেছেন। এই পায়রাগুলির বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে প্রজনন প্রক্রিয়া চালিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন নজর করেছেন। এইসব কাজে তিনি সময় ব্যয় করেছেন তাঁর জীবনের ২২টি বছর।

এইচ এম এস বিগল জাহাজটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের অর্থানুকূল্যে বিশেষ কাজে ব্যবহার করার জাহাজ হিসেবে নির্মিত হলেও, জাহাজটির মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বেলাভূমির জরিপের কাজ। এমনই এক জরিপের অভিযানে (ডিসেম্বর ২৭, ১৮৩১ থেকে অক্টোবর ২, ১৮৩৬, মোট পাঁচ বছরের সামান্য কম সময়), ডারউইন একজন ব্যক্তিগত এবং মুক্ত গবেষক হিসেবে এই অভিযানে শামিল হন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাণের নানান নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রাণের বৈচিত্র্য এবং তার কারণ বা কারণসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হাতে-কলমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

জীববিজ্ঞানের সেই যুগে তথ্য সংগ্রহ এবং এইসব সংগৃহীত তথ্যাবলী যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সাজিয়ে প্রজাতিগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করার প্রাথমিক কাজটি জীববিজ্ঞানে জ্ঞানার্জনের একটি সুষ্ঠু এবং সুসংহত পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষয়ে ডারউইনের অবদান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা আজকের আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে বিগল জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলের জরিপের কাজ যখন চালাচ্ছিল, তখন ডারউইন যত্ন করে এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির নমুনা ও জীবাশ্ম সংগ্রহ করেন। এরপর জাহাজটি তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে, ফিরতি পথে অস্ট্রেলিয়া হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। এই যাত্রায় জলপথে জাহাজটি সারা পৃথিবীকে একবার পুরো ঘুরে আসে। যাত্রাপথের নির্দিষ্ট ২ বছর সময়ে তা করা যায় নি, সময় লাগে প্রায় পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ৩ বছর তিন মাস সময় ডারউইন ডাঙায় কাটান নমুনা সংগ্রহের জন্য, আর প্রায় ১৮ মাস জাহাজে কাটান সেই বিপুল পরিমাণ সংগ্রহকে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রাথমিক কাজের জন্য।

ডারউইনের তত্ত্ব

ডারউইনের তত্ত্ব কেন আজও আমাদের কাছে জীববিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলি বোঝার প্রায় একমাত্র সুসংহত তত্ত্ব, সেটি আত্মস্থ করতে হলে অল্প কথায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রকল্প বা স্পষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অনুমান বা প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরি। যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পেছনে কিছু তথ্যের ভিত্তি থাকে। ভবিষ্যতে আরও জ্ঞানার্জন সম্পন্ন হলে সেই তথ্যগুলি হয় সমর্থিত হয় বা পুরোনো বিষয়গুলি ভ্রান্ত তথ্য বলে নাকচ হয়ে গিয়ে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়। নতুন তথ্য যদি অনুমান বা প্রস্তাবটিকে নাকচ করে দেয়, তবে নতুন প্রস্তাব বা অনুমান বা তত্ত্ব নির্মিত হওয়ার অবস্থা তৈরি হয়। তত্ত্ব তখন ব্যাখ্যা করে চোখের সামনে ঘটে চলা ঘটনাগুলি কীভাবে ঘটে। এই “কীভাবে ঘটে” বিবৃতির সঙ্গে সংযুক্ত প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দেওয়া হলো একটি সফল তত্ত্বের কাজ। খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রমী কোনো কোনো অবস্থায় তত্ত্বটি হয়তো “কেন এমন ঘটছে”, তার সম্পর্কে মোটা দাগে একটা ব্যাখ্যা হাজির করে।

ডারউইনের তত্ত্বের দুটি দিক রয়েছে। একটি আসে “কীভাবে”, এই প্রশ্নের জবাবে, আর অন্যটি আসে “কী কার্য-কারণ সম্পর্কে”, এই প্রশ্নের জবাবে। একটি দিক হলো প্রজাতির বিবর্তন, যা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। একটি আদি পূর্বসূরী থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের প্রজাতি বর্গে আমরা উপনীত হয়েছি। প্রাণীদের একটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের আদলে বিন্যস্ত করা যায়, যার মূলে রাখা যায় সেই আদি পূর্বসূরীকে, যার থেকে বাকি প্রজাতিবৃন্দ সময়ের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়েছে। এই ধারণাটি বির্তনের ধারণা এবং বলাই বাহুল্য, তা স্বতঃসৃষ্টির ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই স্বতঃসৃষ্টির ধারণা বিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ধরে নেয় যে আজকের পৃথিবীতে দৃশ্যমান যাবতীয় প্রজাতি ঠিক এই আজকের প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল, তারা অতীতে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনটিই থাকবে। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব অতীতের প্রাণীদের অবলুপ্তি, যার পরীক্ষালব্ধ হাতে-গরম প্রমাণ হলো অতীতের জীবাশ্ম, অবলুপ্ত প্রাণীদের এক সময়ে উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণকে ধরে নিয়ে স্বতঃসৃষ্টি তত্ত্ব অনুসারী কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ধারাবাহিক এবং সুসংহত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ডারউইনের প্রাণীর বিবর্তনতত্ত্ব এই সব বিষয়গুলিকে একটিই মাত্র সুসংহত তত্ত্বের নিরিখে যুক্তিগ্রাহ্য এবং ধারাবাহিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি যৌক্তিক প্রসারণ-ভিত্তিক অনুমান হাজির করে, যা ভবিষ্যতের পরীক্ষা দ্বারা অনুমানটি সিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে ডারউইন বলেন প্রজাতির প্রাকৃতিক নির্বাচন। অর্থাৎ, বিবর্তন, যা ডারউইন তত্ত্বের প্রথম অংশ, সেটি আমাদের সন্ধান দেয় অতীতে কী ঘটেছে, বর্তমানে কী ঘটে চলেছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে। ডারউইনের তত্ত্বের এই প্রথম অংশ, যেখানে “কী”, এই প্রশ্নের উত্তর মিলছে।

আজকের পৃথিবীতে যে বিপুল বৈচিত্র্যের ও বিপুল সংখ্যক প্রজাতির দেখা আমরা পাই, তাদের উদ্ভব হয়েছে একটি পূর্বসূরী থেকে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রজাতিরই রয়েছে এক পূর্বসূরী, সেই পূর্বসূরীর রয়েছে আর এক পূর্বসূরী, ...। এইভাবে পেছিয়ে যেতে

যেতে আমরা পৌঁছোব এক আদি পূর্বসূরীতে, যিনি সমস্ত প্রাণীর একজন সাধারণ, সর্বজনীন পূর্বসূরী। এই সর্বজনীন সাধারণ পূর্বসূরীর ধারণা ডারউইনের আগেও কেউ কেউ বলেছিলেন, এই ধারণাটির জনক হিসেবে ডারউউন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস-কে যৌথভাবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ডারউইন যেমন গ্যালাপাগোস দীপপুঞ্জের প্রাণীদের দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, ওয়ালেস তেমনি এশিয়ার মালয় দীপপুঞ্জের প্রাণীদের ওপর পর্যবেক্ষণ করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

ডারউইনের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটি এই রকম – প্রজাতির সদস্যবৃন্দ সর্বদাই ছোটো ছোটো, এলোমেলো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়, এই পরিবর্তনগুলি প্রজাতির একজন সদস্য উত্তরাধিকার সূত্রে তার পূর্বসূরীর থেকে লাভ করে, যা সে তার পরের প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে চালান করে। এই ক্ষুদ্র, এলোমেলো পরিবর্তনের জন্য কোনও এক প্রজন্মের কোনো এক সদস্য, সেই প্রজাতির অন্য সদস্য এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে ঐ প্রতিবেশে বাড়তি কিছু সুবিধা পেয়ে যেতে পারে। অনেক সময় এই সব পরিবর্তন প্রজাতির সদস্যদের বাড়তি অসুবিধার মধ্যেও ফেলতে পারে। এই সব মিলিয়ে একটি চলমান প্রতিবেশে এইসব ছোটো ছোটো পরিবর্তন একটি প্রজাতির যে সব সদস্য যথাযথভাবে আত্মস্থ করবে, তারা ঐ প্রতিবেশে বেশি বেশি ছানা-পোনাদের বাঁচিয়ে রাখার বাড়তি সুযোগ পাবে, আর যাদের জন্য এই পরিবর্তন অসুবিধার জন্ম দেবে, তারা তাদের ছানা-পোনাদের সবাইকে প্রতিকূলতার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। ফলে, পরের প্রজন্মে, এদের ছানা-পোনাদের সংখ্যা কমবে আর যারা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, তাদের ছানা-পোনাদের সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে বাড়বে। এই ভাবে একই প্রজাতির একটি গোষ্ঠীভুক্ত অনেকে বেঁচে থাকার বাড়তি সুবিধে পাবে, আর কেউ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার দিকে। এটি একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, যা চলবে প্রজাতি, প্রজাতির সদস্য নিরপেক্ষ ভাবে, এর পেছনে পূর্ব-নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই, নেই কারুর দয়া-দাক্ষিণ্য বা কোপ। এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের, বা অন্যথায়, অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির কোনো ভূমিকাই নেই; প্রকৃতি অন্ধভাবে প্রজাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন করে থাকে। ডারউইন এই প্রক্রিয়াকেই তাঁর তত্ত্বে "প্রাকৃতিক নির্বাচন" এবং "যোগ্যতম-র টিকে থাকা" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এইভাবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক চয়নের মাধ্যমে প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে আকৃতি, অবয়ব, দৈহিক ক্ষমতা, আত্মরক্ষার সরঞ্জাম, গায়ের রং ইত্যাদি বিভিন্ন দৃশ্যমান পরিবর্তন প্রকাশিত হয়। ডারউইন বলেছিলেন যে, প্রজাতির সদস্যদের সংখ্যায় তারাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের আপেক্ষিকভাবে সফল পরিবর্তনগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে রয়ে যাচ্ছে। ডারউইন তত্ত্বায়ন করে বলেন, প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় বা পরিবর্তন কোনো সহায়তা দেয় না, সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। আর যেগুলি কিছু আপেক্ষিক সুবিধা প্রদান করে, সেগুলি প্রজাতির বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হয়ে যায়। ডারউইনের তত্ত্বের যে দুটি দিকের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম, এটি তার প্রথম দিক, যেখানে আমরা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি প্রজাতির বিবর্তনের কথা বলছি। পরিভাষায় এই বিষয়টি "অ্যানাজেনেসিস" নামে পরিচিত।

এবার আসা যাক ডারউইনের তত্ত্বের দ্বিতীয় দিকটিতে, যেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীববিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে প্রসারিত হয়েছে, আমরা ততই বুঝতে পেরেছি যে বিবর্তনের মূল বিষয়টি সম্পর্কে খুবই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ডারউইন কেবল যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রকরণকে সুস্থিত ও সংহতভাবে ব্যবহার করে আবশ্যিক সত্যের কত কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এই দ্বিতীয় দিকটির নাম পরিভাষায় "স্পিসিয়েশন" বা প্রজাতির উদ্ভব। আজকের জ্ঞান মতে আমরা জানি, ডারউইন যাকে প্রজাতির সদস্যদের ভেতর "ক্ষুদ্র, এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন" বলেছিলেন, তা আদতে ঘটে প্রজাতির কোশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ডিএনএ-র অণুর মধ্যে যে অংশটিকে আমরা জিন বলে থাকি, সেইখানে। ডারউইন তাঁর তত্ত্ব নির্মাণের সময়ে জিন-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে জিনের এই পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে, এবং অন্যান্য এখনও পর্যন্ত অজানা কারণে একই প্রজাতির সদস্যদের এক ছোটো অংশে পুঞ্জীভবন ঘটতে পারে, কিন্তু সেই পুঞ্জীভবন একই সঙ্গে একই মাত্রায় সমগ্র প্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে ঘটবে না। যে প্রজাতির যে সামান্য অংশ সদস্যদের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনের পুঞ্জীভবনের শিকার হবে, তারা ঐ প্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল অংশের থেকে ভৌগোলিকভাবে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তারা যে অন্য প্রতিবেশে বসবাস করছে, সেখানে ঐ খাপ-খাইয়ে-নেওয়া সদস্যরা এখন ক্রমাগত তাদের নিজস্ব কায়দায় ঐ প্রতিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে থাকবে। তারা চলবে তাদের নিজের সড়ক ধরে, আর ঐ প্রজাতির অন্য সদস্যবৃন্দ, যারা তাদের অন্য সদস্যদের থেকে ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন, যারা অন্য প্রতিবেশে অন্য ধরনের পরিবর্তনকে হাতিয়ার করে (যেমন ধরা যাক গায়ের রং বা খাদ্যাভ্যাসের জন্য ঠোঁটের আকার সরু বা ধারালো, যা ডারউইন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের পাখিদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন) বেঁচে আছে, তাদের চলার রাস্তা ক্রমশ ভিন্ন হয়ে পড়বে। এই রকম ভিন্ন পথে চলা বেশ কিছু প্রজন্ম ধরে চলতে থাকলে, সময় সীমাটি কয়েক শতক থেকে কয়েক সহস্রাব্দও হতে পারে, এই দুই ভিন্ন পথে চলা একই প্রজাতির সদস্যরা এতটাই পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে যে এক অঞ্চলের সদস্য অন্য এক অঞ্চলের একজন সদস্যের মধ্যে প্রজনন একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখন আমরা দেখব সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন প্রজাতি। অথচ

আমরা যখন আমাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলাম, তখন আমরা শুরু করেছিলাম একটিমাত্র প্রজাতি থেকে। এই যে একটি প্রজাতি থেকে দুটি প্রজাতি-র উদ্ভব যাকে আমরা "স্পিসিয়েশন" বা প্রজাতির উদ্ভব বলেছি, ডারউইনের মতে তা "প্রিন্সিপিল অফ ডারইভারজেন্স" বা বিভিন্নতার সূত্র। এই সূত্রের দ্বারা আমরা অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের বিপুল জীববৈচিত্র্যের একটি সুসংহত ব্যাখ্যা হাজির করতে সক্ষম হয়েছি।

ডারউইনের তত্ত্ব প্রাণের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব, যা তাঁর আগে কেউই এমন যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। ডারউইন চাইছিলেন যে তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্বটি তিনি তথ্য সহযোগে একটু একটু করে, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু তাঁর সেই পরিকল্পনায় একটি অনভিপ্রেত বাধা এসে যায়। ডারউইনের কাছে একদিন ডাকযোগে রাসেল ওয়ালেস-এর একটি প্রবন্ধ এসে হাজির হলো, যেখানে সাধারণ পুর্বসূরী এবং বিবর্তনের ধারণার আলোচনা রয়েছে, ডারউইন দেখলেন তাঁর সমসাময়িক আরও কেউ কেউ প্রায় তাঁর মতো একই ভাবনার শরিক, তখন ডারউইন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি ছোটো আকারে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টি ন্যূনতম তথ্য সহযোগে দ্রুত উপস্থিত করবেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিকল্পনামতো বড়ো আকরগ্রন্থ রচনা করবেন। তিনি দ্রুত গতিতে তাঁর ছোটো বইটি লিখলেন, যাকে আজকে আমরা আটপৌরে নাম, "অরিজিন অফ স্পিসিস" বলে থাকি। ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তনবাদ এবং প্রজাতির উদ্ভব সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি প্রধানত নির্ভর করেছিলেন সেই সময়ের বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মূলত চারটি বিভিন্ন বিভাগ থেকে তথ্য আহরণ করে তাঁর নিজের তাত্ত্বিক কাঠামোকে মজবুত করতে। সেই বিভাগগুলি যথাক্রমে "বায়োজিওগ্রাফি" বা জৈব-ভূগোল, "প্যালিওন্টোলজি" বা পুরাপ্রস্তর বিদ্যা, "এম্ব্রিওলজি" বা ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যা এবং "মরফোলজি" বা অঙ্গসংস্থান বিদ্যা। তেমনি, আজকের এই একবিংশ শতকে ডারউইনের তত্ত্ব বিচারের সময় আমরা তথ্য আহরণ করে সেগুলিকে বিচার করি "পপুলেশন জেনেটিক্স" বা জনগোষ্ঠী বংশগতি বিদ্যা, "বায়োকেমিস্ট্রি" বা প্রাণ রসায়ন, "মলিকিউলার বায়োলজি" বা আণবিক জীববিদ্যা এবং "জেনোমিক্স", যে আন্তর্বিষয়ক বিদ্যাটির এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা পরিভাষা পরিচিত হয়ে ওঠেনি, তাই আপাতত আমরা এই ইংরেজি নামটিই ব্যবহার করব। এই বিদ্যাটি একটি প্রজাতির যাবতীয় লক্ষণ চিহ্নিতকারী ডিএনএ-র গঠনের উপাদান, চারটি নিউক্লিওটাইড (যাদের আমরা সাংকেতিকভাবে তাদের ইংরেজি নামের আদ্যক্ষর এ, টি, জি এবং সি বলে বর্ণনা করে থাকি)-এর সামগ্রিক বিন্যাস এবং সেই বিন্যাস-উদ্ভূত ধর্মবিচারের বিদ্যা বলে খুবই মোটা দাগে চিহ্নিত করতে পারি। এই উদ্ভূত ধর্মের মধ্যে পড়ে ভৌত, রাসায়নিক, প্রাণ-রাসায়নিক এবং জৈব ধর্ম। এই সব আধুনিক বিষয়গুলি ডারউইনের সময়কার প্রায় যৌক্তিক প্রসারণ, এই প্রসারণ আমাদের প্রাণের রহস্য সন্ধানে আরও গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান সরবরাহ করে।

সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা : ডারউইনের দৃষ্টিতে

যে-কোনো একজন প্রথম সারির জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানীর মতো ডারউইন তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন – একদল বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা মনে করেন যে প্রজাতিদের আজকে আমরা যে চেহারায় দেখছি, তারা ঠিক সেই ভাবেই সৃষ্ট হয়েছে, তাদের কোনো বিবর্তন নেই। আবার একদল বিজ্ঞানী রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন যে সৃষ্ট হওয়ার পর প্রজাতিরা আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে একই রকম থাকে না, তাদের অতীতের আদি রূপ আর আজকের বর্তমান রূপ এক নয়। তারা তাদের আদি রূপ থেকে আজকের রূপে পৌঁছেছে বিবর্তনের ফলে। অন্যথায়, তারা পূর্ববর্তী কোনো প্রজাতির উত্তরসূরী হিসেবে আজকে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বের নানান গুরুতর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডারউইন কৃতজ্ঞচিত্তে বিজ্ঞানী বাফুন-এর অবদান স্বীকার করেছিলেন।

বাফুন (সেপ্টেম্বর, ১৭০৭ – এপ্রিল ১৬, ১৭৮৮) ১৭৭৮ সালে জীববিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, যা তৎকালীন, এমনকি আজকের দিনেও চর্চা এবং বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিপরীত কথা বলেছে। নানান পর্যবেক্ষণ ও তাত্ত্বিক বিবেচনার পর বাফুন সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে পৃথিবী খুবই উত্তপ্ত ছিল এবং সময় যত এগিয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ক্রমশ ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে বাফুন পৃথিবীর ঠান্ডা হয়ে আসার হার নির্ণয় করেন এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবীর বয়স কিছুতেই ৭৫ হাজার বছরের কম নয়, আর পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে কম-বেশি ৪০ হাজার বছর আগে।

ডারউইন যাঁর কাছে তাঁর সবচেয়ে বেশি ঋণ স্বীকার করেছেন, তিনি ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ ব্যপ্তিস্তে লামার্ক (১৭৪৪-১৮২৯)। লামার্ক প্রাণের বিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে প্রজাতির বিভিন্নতার কারণ প্রজাতিগুলির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি বলেন যে এক প্রজন্মে একটি প্রজাতির এক সদস্য যে পরিবর্তনের শিকার হয়, তা সে তার পরবর্তী প্রজন্মে চালান করে। লামার্ক এই বিষয়টির নাম দেন "ইনহেরিট্যান্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিশটিক্স" বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বহন। ডারউইনের সঙ্গে লামার্কের পার্থক্য ছিল এই পরিবর্তনের কারণ নিয়ে। লামার্ক প্রশ্ন করেন – কেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পবিরর্তন ঘটে? উত্তরে লামার্ক বলেন, প্রজাতিবৃন্দ বাঁচার জন্য ঠিক যা চায়, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, এই পরিবর্তন প্রজাতির এক সচেতন

প্রচেষ্টার ফল, যা একটি ভ্রান্ত ধারণা বলে ডারউইন নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। লামার্ক-এর এক পরিচিত উদাহরণ হলো – জিরাফের ঘাড় কেন লম্বা? কেননা জিরাফ গাছের উঁচু ডালের পাতা খেতে চেয়েছিল। এর ফলে, কয়েক প্রজন্ম পরে, ঘাড়ের্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্জিত বর্ধিত দৈর্ঘ্য যোগ হতে হতে জিরাফের ঘাড়টি বেশ বড়ো দৈর্ঘ্যের হয়ে গেল।

লামার্ক-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর এই অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বহন সংক্রান্ত তত্ত্ব গুরুতর প্রশ্নচিহ্নের সামনে পড়ে। লামার্ক-এর তত্ত্ব, ডারউইনের তত্ত্বের মতোই জীবজগতের বিবর্তন ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় "কী প্রক্রিয়া" এবং "কেমন ভাবে প্রক্রিয়াটি চলে", এই দুই বিষয়ের ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন, ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর সমর্থকের অভাব ছিল না। যেমন, তাঁর একজন চৌখস সমর্থক চিলেন জেফরি সেইন্ট হিলারি। তিনি লামার্ক-এর সমর্থনে এগিয়ে এসে বলেন, সমস্ত প্রাণীর আকৃতির পেছনে একটিই মাত্র নির্মাণ-নকশা ক্রিয়াশীল, যেটি অন্তর্বস্তুর দিক থেকে দেখলে অণুজীব থেকে প্রকাণ্ড হাতি, সবাইয়ের ক্ষেত্রেই মূলত একই। কেবলমাত্র অসংখ্য ছোটোখাটো পরিবর্তনের মাধ্যমে (যেমন গৌণ অঙ্গ যোগ করা বা বাদ দেওয়া) প্রকৃতি সেই মূল নকশাটি থেকে অগণিত ভিন্ন ভিন্ন নকশা তৈরি করছে মাত্র। বিবর্তন মূলত মেনে নিলেও হিলারি বিশ্বাস করতেন যে বিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে যেই মাত্র মানুষের উদ্ভব ঘটল, ঠিক তখনই বিবর্তন স্তব্ধ হয়ে গেছে, পৃথিবী প্রাণের আর কোনো বিবর্তন ঘটছে না। তাঁর মত ছিল বিবর্তন এক অতীতের প্রক্রিয়া, যা বর্তমানে ঘটছে না, তাই এই প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা নেই, অতএব তা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না।

লামার্ক-এর একজন কড়া সমালোচক ছিলেন বিজ্ঞানী ক্যুভিয়ের। তিনি লামার্ক-এর তত্ত্বের সমালোচনায় বলেন যে লামার্ক-এর তত্ত্ব দুটি আলাদা আলাদা ভ্রান্তিকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, লামার্ক-এর এই "অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার"-এর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ মেলেনি। দ্বিতীয়ত, এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করার বিষয়ে লামার্ক প্রাণীর শারীরতত্ত্বর চেয়েও প্রাণীর মনস্তত্ত্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এক কথায়, মানুষের মধ্যে দৃষ্ট ইচ্ছাশক্তিকে যাবতীয় প্রাণীর ধর্ম বলে তিনি ধরে নিয়েছেন, এই ধরে নেওয়ার পেছনে কোনও পোক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সমর্থন নেই।

সব দিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, আধুনিক ভূবিদ্যার জনক, চার্লস লাইয়েল-এর উত্থাপিত লামার্ক-এর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। লাইয়েল দেখান যে সেই সময়ে সংগৃহীত যাবতীয় জীবাশ্ম যদি বিচার করা যায়, তবে লামার্ক-এর "অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার" তত্ত্বমতে প্রজাতির মধ্যে পরম্পরা দেখাতে সেই তত্ত্ব ব্যর্থ।

ডারউইন তাঁর বই-এর মুখবন্ধে ডব্লু সি ওয়ালেস-এর নাম করে বলেন যে, ওয়ালেস-ও প্রজাতির প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা দিয়েছিলেন সেই ১৮১৩ সালেই। আবার ডারউইন এবং ওয়ালেস ১৮৫৯ সালে যে ধারণা দেন, প্যাট্রিক ম্যাথিউ ১৮৩১ সালে প্রায় সেই ধারণা দেন। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট হুক-ও সমস্ত প্রাণীর জন্য একটি আদি পূর্বসূরী এবং সেই আদি প্রাণী থেকে পরিবর্তিত হয়ে অসংখ্য প্রজাতির সৃষ্টির ধারণায় উপনীত হন।

ডারউইন : তত্ত্ব-সাক্ষ্য-প্রমাণ

বায়োজিওগ্রাফি বা জৈব-ভূগোল নামক বিভাগ থেকে ডারউইন নিজেই তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য তুলে এনেছিলেন। এই বিভাগ থেকে যিনিই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাঁরই চোখে পড়বে যে প্রায় একই প্রজাতির বা খুব কাছাকাছি স্বভাবের প্রজাতিবৃন্দ, যাকে ডারউইন "ক্লোসলি অ্যালায়েড" বা খুবই কাছাকাছি প্রকৃতির বলে বর্ণনা করেছিলেন, তারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে বা বসবাস করতে পছন্দ করে। এই সব খুব কাছাকাছি প্রকৃতির প্রজাতিবৃন্দের অঙ্গসংস্থান নকশা প্রায় একই ধরনের। অন্যথায়, একই অঙ্গসংস্থান নকশা-অধিকারী প্রজাতিরা একই মহাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকতে পারে, যেমনটি আমরা দেখি আফ্রিকা মহাদেশে, যেখানে বহু প্রজাতির জেব্রা দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে আছে। এখানে খেয়াল করা দরকার যে, একই অঙ্গসংস্থান নকশা হওয়া সত্ত্বেও এইসব প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান বিষয়ে পছন্দ, এমনকি আবহাওয়া, এই সবই একে অন্যের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। ডারউইন নিজেই দেখেছিলেন যে দক্ষিণ আমেরিকার দুটি লাগোয়া অঞ্চলে উড়তে-অক্ষম এমন দুটি বৃহৎ পাখির বসবাস রয়েছে, কিন্তু সেখানে আফ্রিকার উটপাখি বা অস্ট্রেলিয়ার এমু গিয়ে বাসা বাঁধেনি। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের সময় ডারউইন তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন যে, এই দ্বীপপুঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন "মকিং বার্ড" বা বলা যায তোতাপাখির বসবাস রয়েছে। তাই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, লাগোয়া অঞ্চলে কাছাকাছি দেখতে প্রজাতিরা কেন ভিড় করে বসবাসের জন্য পাড়ি জমায় না, আর কেউই-বা ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের প্রায় একই রকম প্রতিবেশে সেই সব প্রজাতির সদস্যরা ভিড় জমায় যারা মোটেই কাছাকাছি নয়? এর ব্যাখ্যা আমরা ডারউইনের নিজের ভাষাতেই বলতে পারি : "এইসব তথ্যাদি থেকে আমরা এক গভীর জৈব ঐক্য পর্যবেক্ষণ করতে পারি। সেই ঐক্যটি, আমার নিজের বিবর্তন তত্ত্বমতে আসছে স্রেফ উত্তরাধিকারের ধারণা মেনে।" একই ধরনের প্রজাতি একই প্রতিবেশে বাঁচতে পারে, কেননা তারা একজন সাধারণ পূর্বসূরীর উত্তরসূরী।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে ডারউইন দেখান যে খুব কাছাকাছি অঙ্গ-সংস্থানের প্রজাতিদের ভূত্বকের দু'টি পর-পর ওপর-নিচ স্তরে পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে। একটি প্রজাতি প্রায় ১০ লক্ষ বছর বেঁচে থাকার পর বিলুপ্ত হয়ে

যাচ্ছে, আর তাকে প্রতিস্থাপিত করছে (জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে এবং দেখতে পাচ্ছি) প্রায় একটি সমগোত্রীয় প্রজাতি, কিন্তু বিলুপ্ত প্রজাতির সঙ্গে তাকে সর্বাংশে সর্বসম বলা যায় না। ডারউইন নিজেই উত্তর আমেরিকার উদাহরণ টেনেছেন। এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন জীবাশ্ম প্রায় ঘোড়া-গোত্রীয় লুপ্ত প্রাণী হাইরাকোথেরিয়াম, যেটি লুপ্ত হয়েছে তার এক উত্তরসূরী রেখে, জীবাশ্মে প্রাপ্ত সেই উত্তরসূরীর আমরা নাম দিয়েছি ওরোহিপ্পাস। এই ওরোহিপ্পাস প্রাণীটি লুপ্ত হয়েছে তার এক উত্তরসূরী রেখে, এপিজিপ্পাস, তারপর মেসোহিপ্পাস এবং মার্কিন ঘোড়ার সুদূর পূর্বসূরী। এদেরই কেউ কেউ বেরিং যোজক পেরিয়ে এশিয়ায় এসেছে, পাড়ি দিয়েছে ইউরোপ ও আফ্রিকায়। আজ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে এই জীবদের সবাই পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে; উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছে ডিনোহিপ্পাস নামের প্রায় আদি ঘোড়ার প্রজাতি, যার থেকে আধুনিক, বর্তমান কালে লভ্য ঘোড়ার যে আদি গণ ইকুয়াস-এর উদ্ভব হয়েছে। ডারউইন তাঁর জীবদ্দশাতে পর পর এতগুলি প্রজাতির জীবাশ্ম সংগ্রহ করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর সংগৃহীত খণ্ডিত জীবাশ্ম সংগ্রহ বিচার করে তিনি একটি সঙ্গত প্রশ্ন তোলেন, এই যে ধারাবাহিক, পরস্পর-সংযুক্ত জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেল, তা কী নিতান্তই আকস্মিক, নেহাতই সমাপতন? এই প্রশ্নের উত্তরে ডারউইন বলেছেন যে, যারা কাছাকাছি অঙ্গ-সংস্থানের প্রজাতি, তারা একই লাগোয়া অঞ্চলে বসবাস করে বিভিন্ন কালসীমায় তাদের বিভিন্ন উত্তরসূরী রেখে গেছে। এই উত্তরসূরীদের আমরা জীবাশ্মের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারছি এই কারণে যে, তারা একই সাধারণ পূর্বসূরীর বংশধর।

ভ্রূণতত্ত্ব থেকেও ডারউইন তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য আহরণ করেছেন। এইসব তথ্যের ব্যাখ্যায় ডারউইন লিখেছেন, “[প্রাণীর] ভ্রূণাবস্থা হলো তার সবচেয়ে কম পরিবর্তিত অবস্থা, [তাই ভ্রূণ] তার পূর্বসূরীর যাবতীয় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ করে। অর্থাৎ, যে সব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির অতীত পূর্বসূরী এক, ভ্রূণাবস্থায় তারা তাদের সেই অতীত পূর্বসূরীর ভ্রূণের আকারকেই প্রকাশ করে।”

আর যে বিভাগটি থেকে তথ্য নিয়ে ডারউইন তাঁর তত্ত্বটিকে সমৃদ্ধ করেন, সেটি হলো অঙ্গ-সংস্থান বিদ্যা। এই বিদ্যা থেকে আমরা জানতে পারছি, কীভাবে বহিরঙ্গ দেখে আমরা বিভিন্ন প্রজাতিকে ছোটো গোষ্ঠী, যেটি একটি মাঝারি গোষ্ঠীর অধীন, যেটি আবার একটি বড়ো গোষ্ঠীর অধীন, এইভাবে ভাবতে পারি।

এইভাবে আমরা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমগ্র প্রাণীকুলকে একে অপরের অধীন, এইভাবে সাজিয়ে ফেলতে পারি। এই বিন্যাসটি দেখতে হবে অনেক শাখা-প্রশাখা সহ একটি গাছের মতো, যার মূল নির্দেশ করছে প্রতিটি প্রাণীর আদি পূর্বসূরীকে; বিভিন্ন উত্তরসূরী বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি না একটি শাখা বা প্রশাখায় স্থান পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেরোয়াড়দের গোল দেওয়ার সংখ্যাকে আমরা কিন্তু এই রকম ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারব না। এর কারণ প্রাণীকুল জন্মসূত্রে পরস্পরের নিকট অথবা সুদূর আত্মীয়, কেননা প্রত্যেকেই এক আদি পূর্বসূরীর উত্তরসূরী, কিন্তু বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের গোল দেওয়ার সংখ্যার মধ্যে এই আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, সংখ্যাগুলি স্বাধীন, একটার থেকে অন্য একটার উৎপত্তি হয়নি।

ডারউইনের তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এই “জীবনবৃক্ষ”-এ কেবলমাত্র জীবাশ্মে প্রাপ্ত, লুপ্ত প্রাণীকুলকেও তাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা যায়। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাতে পাঁচটি আঙুল থাকে। তাদের হাতের আঙুলের হাড়ের ছোটো ছোটো টুকরোগুলির একটি নির্দিষ্ট আকৃতির হয়ে থাকে। এই পাঁচ আঙুল বা হাড়ের আকৃতি কেবলমাত্র মানুষ বা বনমানুষ গোত্রের জীবেদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে তা ভিন্ন রূপ বা আকৃতি নিলেও তা দৃশ্যমান বিড়াল, কুকুর, বাদুড় এমনকি টিকটিকির মধ্যেও। একই কথা বলা যায় মানুষের হাঁটু থেকে পায়ের পাতাকে সংযুক্ত করার হাড় দুটির জন্য (টিবিয়া ও ফেবুলা)। অন্যান্য স্তন্যপায়ী, এমনকি অনেক সরীসৃপের অঙ্গ-সংস্থানে এবং শারীরস্থানে এরা দৃশ্যমান। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, দীর্ঘদিন আগে বিলুপ্ত, পাখির আদলের সরীসৃপ (যার জীবাশ্ম পেয়েছিলেন ডারউইন), সেই আর্কিয়েপ্টেরিক্স-কে আমাদের পূর্ব-বর্ণিত “জীবন-বৃক্ষ”-এ তার যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। ডারউইন প্রশ্ন তোলেন, এই একই ধরনের অঙ্গসংস্থান নকশা থাকা কি নেহাতই সমাপতন? তাঁর তত্ত্ব থেকে ডারউইনের উত্তর : প্রাণীজগতে এই একই ধরনের অঙ্গসংস্থান নকশার মূল উৎস হলো যে, এগুলি এসেছে একজন সাধারণ পূর্বসূরী থেকে, তারপর প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের নানান পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারা আদি পূর্বসূরীর মূল নকশাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিজ্ঞানের যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থেকে আমরা নানান আলাদা আলাদা উদাহরণ উদ্ধার করলাম, ডারউইনের তত্ত্ব ছাড়া আর কোনো তত্ত্বই একটিমাত্র সূচনাবিন্দু থেকে শুরু করে এত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। এখানেই ডারউইনের প্রতিপাদ্যটি “ধারণা”, “প্রকল্প”, বা “অনুমান”-এর স্তর অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ডারউইনের তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে?

আধুনিক জীববিজ্ঞানে বিবর্তন বিষয়টি বুঝতে গিয়ে দু'টি মূল ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটিকে পরিভাষায় বলা হয়, “মাইক্রো এভোলিউশন” বা ক্ষুদ্র বিবর্তন এবং অন্যটি “ম্যাক্রো এভোলিউশন” বা বৃহৎ বিবর্তন। ক্ষুদ্র বিবর্তন বলতে বোঝানো হয় একটি প্রজাতির কিছু সদস্যের মধ্যে যে ছোটোখাটো পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলোকে, যে পরিবর্তন প্রজাতির ঐ সব সদস্যকে

প্রতিবেশের সঙ্গে মসৃণভাবে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, বৃহৎ পরিবর্তন বোঝানো হয় যে সমগ্র একটি প্রজাতি, যারা তাদের সাধারণ পূর্বসূরী থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সেই পূর্বসূরী থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এই বৃহৎ পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে ডারউইন বলেছিলেন যে, এই বিবর্তন একটি ধীরগতিতে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হওয়া প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি প্রজাতি তার অঙ্গসংস্থান পরিবর্তিত করে প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে অন্য একটি প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়ে যায়। এই বিষয়টি আধুনিক বিবর্তনবাদীরা নামকরণ করেছেন "ফাইলেটিক গ্র্যাজুয়ালিজম" বা জীবনবৃক্ষে অবস্থানের ধীরগতি ধাপে ধাপের প্রক্রিয়া। ডারউইন তত্ত্বমতে জীবাশ্ম সংগ্রহের সুসংহত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তিনজন বিজ্ঞানী নিরপেক্ষভাবে দুটি বিষয় সুপারিশ করেন। এই তিনজন বিজ্ঞানীর নাম (সময়ের ক্রম অনুসারে) গুল্ড, এল্ডরিজ এবং স্ট্যানলি।

এই তিন বিজ্ঞানীর বক্তব্য হলো বিবর্তনের চিহ্ন সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় যখন একটি প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে অন্য একটি নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়। এই ঘটনা ঘটার আগে একটি দীর্ঘ সময় প্রজাতিগুলির অঙ্গসংস্থানে বিশেষ হেরফের হয় না। সময়টা এমনকি ১০ লক্ষ বছরও হতে পারে। প্রজাতির অবয়বের এই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থার পারিভাষিক নাম "স্ট্যাসিস" বা স্থিরদশা। এই স্থিরদশার ব্যাখ্যা: প্রজাতির মধ্যে যেসব সদস্যের অঙ্গসংস্থানের গুরুতর বিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে। বেঁচে থেকেছে শুধু তারাই, তাদের পরিবর্তন প্রতিবেশের উপযোগী এবং তাদের সবাইয়ের গড়পড়তা অঙ্গসংস্থান প্রায় একই রকম। জীবাশ্ম দেখলে মনে হবে তারা সবাই একই জাতের, অপরিবর্তিত, যা কিনা স্থিরদশাকে সূচিত করে। এই তিন বিজ্ঞানী বলেন যে স্থিরদশায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর প্রজাতিদের মধ্যে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন আসে, যেন দুই পরিবর্তিত দশাকে স্থিরদশা একটি যতিচিহ্ন মারফত সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখে। এই ধারণাকে বলা হয় "পাঙ্কচুয়েটেড ইকুলিব্রিয়াম" বা যতিজনিত সাম্যাবস্থা। স্ট্যানলির মতে, প্রজাতির ক্ষুদ্র পরিবর্তনের বৃহৎ পরিবর্তনে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে ডারউইনের যে ধারণা, সেটি পরিবর্তনের প্রয়োজন। জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে স্ট্যানলি দেখতে চান প্রাণীজগতে বাদুড় এবং তিমি-র রূপান্তরের জন্য কত সময় লেগেছে। জীবাশ্ম বিশ্লেষণে জানা গেছে যে বাদুড় এবং তিমি-র পূর্বসূরী আসলে এক জাতের ইঁদুর গোত্রীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। এই আদি পূর্বসূরী থেকে উত্তরসূরী হিসেবে বাদুড় এবং তিমি-তে পৌঁছোতে সময় লেগেছে কম-বেশি ১ কোটি বছর থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ বছরের মতো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সময়সীমায় এত বৃহৎ পরিবর্তন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উপনীত হওয়া কার্যত অসম্ভব। অতএব এই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে আমাদের যতিজনিত স্থিরদশার কথা আলোচনায় আনতেই হবে। স্ট্যানলি অবশ্য ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব বাতিল করেন নি, তাঁর বক্তব্য হলো, ডারউইন এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর যতটা জোর দিয়েছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে বিবর্তনের জন্য এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ততটা প্রভাব নেই।

এই বিতর্কে গুল্ড একটি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত যোগ করেন। তাঁর বক্তব্য : স্থিরদশার সময় বড়ো বড়ো পরিবর্তনগুলো নাকচ হয়ে যায় এবং গড়পড়তা পরিবর্তনগুলো নির্বাচিত হয়, এমন ঘটনা চলতেই পারে না, কেননা গড়পড়তা যেসব পরিবর্তন প্রতিবেশের জন্য উপযোগী, সেই প্রতিবেশটিই দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে একই রকম থাকতে পারে না, থাকেও না। অতএব, এই গড়পড়তা পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত আর প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী থাকতেই পারে না। গুল্ড-এর মতে এই নির্বাচন চলে ক্ষুদ্র বির্তন এবং বৃহৎ বিবর্তন স্তরে একই সঙ্গে, বিশেষত জিন স্তরে, যেখানে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে জিনের বিভিন্নতা বিরাট মাত্রায় প্রকট হতে পারে। অর্থাৎ, বিবর্তন ঘটে চলতেই পারে, কিন্তু তার ছাপ বা চিহ্ন জীবাশ্ম থেকে উদ্ধার করা যাবে না।

জীবাশ্মবিদ্যায় দক্ষ নীল এল্ডরিজ এই বিতর্কে একটি তৃতীয় প্রেক্ষিত যোগ করেন। তাঁর মতে : ডারউইনের তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জের বিষয়টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে সময়সীমার প্রশ্নে। জীবাশ্ম থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রজাতির অঙ্গসংস্থান অপরিবর্তিত থাকছে প্রায় কয়েক কোটি বছর, তারপর আকস্মিকভাবে তা ১ লক্ষ থেকে ৫০ হাজার বছরের মধ্যে বিরাট পবিবর্তিত হতে দেখা যাচ্ছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা অপরিবর্তনের সময়সীমাকে যতিজনিত স্থিরদশা বলে বর্ণনা করছি। কিন্তু যে সময়কাল ভূতাত্ত্বিক সময়কাল, তা বিবর্তনের সময়কালের চেয়ে অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। ভূতাত্ত্বিক সময়কালে যে ঘটনাকে দ্রুত গতির বা মন্থর গতির বলা হচ্ছে, বিবর্তনের সময়কালের নিরিখে দুটোই ধীর গতির। অতএব, স্থিরাবস্থা বা যতিজনতি স্থিরদশা, এর কোনোটার সঙ্গেই ডারউইনের তত্ত্বের কোনও বড়ো রকমের বিরোধ নেই।

ডারউইন যে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েই এক শ্রেণীর ছোটো পাখির বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠোঁটের চেহারা দেখেছিলেন এবং খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে ঠোঁটের সেই বৈচিত্র্যকে সংযুক্ত করে তাঁর সফলতম প্রজাতির প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন, বর্তমান কালের দুই বিজ্ঞানী, রোজমেরি গ্রান্ট ও পিটার গ্রান্ট সেই গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলিতে বেশ কয়েক দশক অতিবাহিত করেছেন। এই দুই বিজ্ঞানী, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে ডারউইন-বর্ণিত পাখিগুলির ঠোঁটের পরিমাপ নিয়েছেন। এই কাজ তাঁরা চালিয়েছেন প্রায় ২১টি প্রজাতির ওপর বেশ কয়েকটি প্রজন্ম ধরে। তাঁদের পর্যবেক্ষণে ডারউইন-বর্ণিত বির্তনের স্পষ্ট রূপায়ণ নির্ণয় করা গেছে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক পরীক্ষাগারে এখন বিবর্তনের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে। এটি এখন আর অনুমিতিভিত্তিক সিদ্ধান্ত বলে খাটো করা যাবে না।

এতো গেল প্রাকৃতিক পরীক্ষাগারে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে ধীর গতি বিবর্তনের পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষাগারেও ঠিক একই বিষয় পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা আগে যে "অ্যানোজেনেসিস"-এর কথা বলেছি, প্রকৃতি এবং বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগার, এই দুই স্থানেই তার সমর্থন মিলেছে। উইলিয়াম রাইস এবং জর্জ সল্ট, ড্রোসোফিলা মেলানোগাস্টার নামক এক জাতের ফলের মাছির জেনেটিক্স এবং প্রাণ রসায়নের সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ। তাঁরা এই মাছির অধঃস্তন ৩৫টি প্রজন্ম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে পরীক্ষাগারেই "অ্যানোজেনেসিস" প্রক্রিয়া দেখতে পেয়েছেন।

যে তথ্যগুলির সহজ ব্যাখ্যা ডারউইনের সাধারণ পূর্বসূরীর ধারণা থেকে মেলে সেগুলি হলো (ক) প্রাণের স্পন্দন এবং প্রজননের জন্য চারটি মূল প্রক্রিয়া থাকতেই হবে এবং যত প্রাণী এবং উদ্ভিদ রয়েছে, তাদের এই চারটি মূল প্রক্রিয়া পরিচালনা করার কাঠামো সামান্য পরিবর্তন ছাড়া মৌলিকভাবে একই, (খ) যদিও আমাদের পৃথিবীতে অসংখ্য বৃহৎ অণু-সমন্বয়-এর দেখা মেলে, তবুও প্রতিটি প্রাণী কেবলমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড, পলিপেপটাইড এবং পলিস্যাকারাইড ব্যবহার করে। প্রাণের ক্ষেত্রে এর কোনও ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না, (গ) যে-কোনো প্রজাতির প্রাণীকেই বেছে নেওয়া হোক না কেন, তাদের যে ডিএনএ এবং আরএনএ, তাদের আবর্ত (অর্থাৎ তারা ডান দিকে না বাঁ দিকে পাক খেয়ে আছে) নির্দিষ্ট, যদিও রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব বৃহৎ অণুর দুটি আবর্তের কাজ একই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রসায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে আরএনএ-র বর্তনীর মধ্যে চারটি কেন্দ্র আছে, অর্থাৎ, একই রাসায়নিক ধর্ম-বিশিষ্ট ১৬টি ভিন্ন রূপের আরএনএ হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রাণীকুল এই ১৬টির মধ্যে কেবলমাত্র একটি রূপেরই আরএনএ ব্যবহার করে, (ঘ) প্রকৃতিতে ১০২টি বিভিন্ন নিউক্লিওসাইড লভ্য হলেও ডিএনএ এবং আরএনএ কেবলমাত্র চারটি নিউক্লিওসাইড দিয়েই নির্মিত। প্রকৃতিতে ৩৯০ জাতের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গেলেও এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর দেহে কেবলমাত্র ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

একটা সময়ে বিজ্ঞানীরা এককোশী জীব নিয়ে গবেষণা চালাতেন। প্রাণ রসায়ন এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার পদ্ধতির বিষয়গুলি যত ক্ষুরধার হয়েছে, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ততই এককোশী প্রাণীদের জগৎ ছেড়ে বহুকোশী প্রাণীদের দুনিয়ায় প্রসারিত হয়েছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে দুটি বৃহৎ প্রোটিন অণুর দিকে, যাদের প্রায় সমস্ত বহুকোশী প্রাণীদের মধ্যে দেখা মেলে। এদের নাম হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিন। এদের ত্রিমাত্রিক কাঠামো কেমন তাও আমাদের গত শতকের পঞ্চাশের দশকে জানা হয়ে যায়। হিমোগ্লোবিন প্রোটিনটি প্রাণীদেহের রক্তে অক্সিজেন বহন করে, আর মায়োগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন থেকে অক্সিজেন নিয়ে কলা-র মধ্যে কাজে লাগার আগে পর্যন্ত সেই অক্সিজেন জমিয়ে রাখে। এই প্রোটিন দুটির অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাস জানার প্রক্রিয়া আয়ত্তে আসার পর বিজ্ঞানীরা অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ, উভচর, মাছ, কীট এবং শামুকের থেকে পৃথক করা হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড বিন্যাস বের করেন। দেখা যায় বিভিন্ন প্রাণীর থেকে পাওয়া এই দুটি প্রোটিনের বিন্যাস থেকে সহজেই প্রতিভাত হয় যে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দুটি প্রাণীর থেকে পৃথকীকৃত প্রোটিন, যেমন তিমি মাছের মায়োগ্লোবিন এবং ঘোড়ার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথকীকৃত এই দুই প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করে একটি নিরপেক্ষ "জীবনবৃক্ষ" নির্মাণ করা হয়। এই জীবনবৃক্ষ সবদিক থেকেই জীবাশ্ম এবং অঙ্গসংস্থান-ভিত্তিক যে জীবনবৃক্ষের কথা আমরা আগেই বলেছি, তার সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিলে যায়। অঙ্গসংস্থান-ভিত্তিক জীবনবৃক্ষের মূল কথা আদি পূর্বসূরী থেকে বিবর্তনের ফলে উত্তরসূরীর জন্ম। এই বিষয়টি আদি প্রাণ অণুর জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য।

সমস্ত ইউক্যারিওটিক প্রাণীকোশ-এ (এই কোশগুলির ভেতরে নিউক্লিয়াস ছাড়া অন্যান্য নানান বস্তু আলাদা আলাদা ঠোঙায় ভরে একে অন্যের থেকে পৃথক অবস্থায় থাকে) সাইটোক্রম-সি জিনটি বিদ্যমান। তাই বলা যায় যে, যে সব প্রাণীর এই জিনটি রয়েছে, তাদের অঙ্গসংস্থানের সঙ্গে এই জিনটির সঙ্গে জড়িত প্রোটিনটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকা অসম্ভব, কেননা এই সমস্ত বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গসংস্থান বিভিন্ন। আবার, প্রাণী বা উদ্ভিদের ব্যবহার করা অ্যামাইনো অ্যাসিডের বেশ কয়েকটির জন্য একাধিক জেনেটিক কোড বিদ্যমান, অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন ডিএনএ-র বিন্যাস থেকে একই প্রোটিন পাওয়া সম্ভব। সাইটোক্রম-সি জিন-এর সর্বব্যাপিতা এবং অতিরিক্ততা থাকার কারণে ডিএনএ-এর এমন বিন্যাস পাওয়া সম্ভব, যেগুলি প্রজাতির অঙ্গসংস্থান নিরপেক্ষ। এই জাতীয় বিন্যাস ব্যবহার করে জীবনবৃক্ষ নির্মাণ করে তাতে যদি বিভিন্ন প্রজাতির, বর্তমানের এবং অতীতের (জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত) নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা যায় এবং সেই বৃক্ষ যদি যুক্তিগ্রাহ্য এবং অঙ্গসংস্থান-ভিত্তিক জীবনবৃক্ষের সঙ্গে মিলে যায়, তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, প্রজাতিগুলির মধ্যে পূর্বসূরী-উত্তরসূরী সম্পর্ক বিরাজ করছে, যা ডারউইনের তত্ত্বকে নিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্টা দিচ্ছে।

বর্তমানের জীববিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক বিষয় হলো জেনোমিক্স, প্রোটিওমিক্স, বা সাধারণভাবে যাকে "ওমিক সায়েন্স" বলা হয। জীববিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ধারণা এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্র, এই দুই পদ্ধতির যুগলবন্দি প্রাণের রহস্য ভেদ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। যত বেশি আমরা তথ্য আহরণ করছি, প্রাণ সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারছি, ডারউইনের মূলতত্ত্বের সারবত্তা তত বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর এখানেই রয়েছে ডারউইনের তত্ত্বের সমসাময়িকতা এবং প্রাসঙ্গিকতাও।■

বিজ্ঞানের খবর

ফেব্রুয়ারি ১

*ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'র একদল অধ্যাপক সম্প্রতি এক গবেষণায় জানিয়েছেন, ইতালীয় বহুবিদ্যাজ্ঞ পন্ডিত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'র বিভিন্ন রচনায় (পঞ্চদশ শতাব্দী) মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের হদিশ পাওয়া গেছে। পতনশীল বস্তুর তির্যক পতনের তুলনা ইত্যাদি ছিল ঐ গবেষকদের গবেষণার বিষয়। পরবর্তীকালে দ্য ভিঞ্চি'র পরীক্ষালব্ধ ফলাফলগুলি নিউটনীয় বলবিদ্যা (সপ্তদশ শতাব্দী) পতনশীল বস্তুর ত্বরণ ও মাধ্যাকর্ষণ-এর সম্পর্কপ্রমাণিত হয়। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'র হাতে লেখা রচনা সংকলন যা 'কোর্ডেক্স আরুন্ডেল' নামে খ্যাত, ২৮৩ পাতার একটি নোট বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে বলবিদ্যা ও জ্যামিতির গাণিতিক হিসাব নিকাশ। (লিওনার্দো)

*এডিনবার্গ ও ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল কম্প্যুটার বিজ্ঞানী সম্প্রতি এক গবেষণায় জানিয়েছেন যে চিনের বেশ কয়েকটি মোবাইল কোম্পানি তাদের তৈরী করা ফোনে কয়েকটি অ্যাপ যুক্ত করেছে, যার মাধ্যমে ফোন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য থার্ড পার্টির কাছে চলে যাচ্ছে। গবেষকেরা জানাচ্ছেন যে ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই ফোনে সংরক্ষিত ডেটা, ফোনের অবস্থান, কথোপকথন ইত্যাদি ফোন ও অ্যাপ প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে চলে যাচ্ছে যা নিষ্ক্রিয় করার কোনও উপায় নেই। ব্যবহারকারী দেশের বাইরে থাকলেও তা সক্রিয় থাকছে। (টেকএক্সপ্লোরডটকম)

ফেব্রুয়ারি ৬

*মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতি গ্রহের নতুন ১২টি উপগ্রহের সন্ধান পেলেন। এই নিয়ে সর্ববৃহৎ গ্রহটির মোট উপগ্রহের সংখ্যা হল ৯২টি। (সিএনএন)

ফেব্রুয়ারি ৭

* রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে ২০50 সাল নাগাদ, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্রিয়া জনিত কারণে বছরে ১০ মিলিয়ন মৃত্যু ঘটতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে উত্তর আমেরিকায় গৃহপালিত শূকর ও বন্য শূকরের সংমিশ্রনে প্রাপ্ত শূকরের মাংস থেকে মানুষের শরীরে এই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে যা পক্ষান্তরে প্রকৃতির উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। (ন্যাশনাল জিওগ্রাফি)

ফেব্রুয়ারি ১৪

* আমেরিকার ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টার-এর নথিভুক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বছর পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে বরফের বিস্তার সাম্প্রতিক বছরের মধ্যে ন্যূনতম। যার পরিমাণ ১.৯১ মিলিয়ন বর্গ কিমি। গত বছর যার পরিমাণ ছিল ১.৯২ মিলিয়ন বর্গ কিমি। এই পরিসংখ্যান ১৯৭৯ সাল থেকে ঐ সংস্থা দ্বারা সংরক্ষিত। (দ্য গার্ডিয়ান)

* চতুষ্পদীয় প্রাণীর স্বরযন্ত্র-এর কাজ প্রধানত তিনটি, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা, বায়ু চলাচলের পথকে সুরক্ষিত রাখা ও কণ্ঠস্বর। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি প্রাগৈতিহাসিক জীব পিনাকোসরাস-এর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে ক্রেটাসিয়াস যুগের এই চতুষ্পদী জীবটির কণ্ঠস্বর ছিল পাখীর মতো। এই গবেষণা জীবের কণ্ঠস্বরের ক্রমবিকাশ জানতে সাহায্য করবে। (টাইমস অব ইন্ডিয়া)

ফেব্রুয়ারি ২২

*দক্ষিণ ফ্রান্সের রোন উপত্যকা অঞ্চলের বিভিন্ন গুহা থেকে প্রায় ৫৪০০০ বছরের পুরাণ ২০০টি তীর ধনুকের সন্ধান পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। এই প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে এমন তীর ধনুকের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। তাদের অনুমান ঐ গুহাগুলিতে আদিম হোমো সেপিয়ান্স নিয়ানডারথাল-দের বসবাস ছিল যারা ঐ প্রযুক্তি ব্যবহার করত। (সিএনএন)

ফেব্রুয়ারি ২৭

* এযাবৎ সৌর শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য সোলার প্যানেলে সিলিকন ব্যবহার করা হত। সম্প্রতি নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানী পেরভস্কাইট (ক্যালসিয়াম-টাইটানিয়াম অক্সাইড) নামক একটি আকরিক ব্যবহার করে উন্নত ধরনের সোলার প্যানেল বানাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে সোলার কোষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হবে। (দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট)

মার্চ ১

* ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি ব্লুমিংটন-এর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে তৈরী করা স্নায়ু কোষ বা অর্গানয়েডকে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। (নিউ সায়েন্টিস্টস)

*প্রাচীন ইউরোপীয় জিন সংক্রান্ত এক সুবিশাল তথ্যভান্ডার বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন। বিগত বরফ যুগের সময়কালে নবপ্রস্তর যুগ ও মধ্যপ্রস্তর যুগীয় জনজাতিদের সংমিশ্রণের ইতিহাসের বহু নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এর মাধ্যমে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জিনবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন কিভাবে

জিনের সংমিশ্রণের ফলে অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (বিশেষত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে) উন্নত হয়েছে ও মানুষের চামড়ার রঙের পরিবর্তন ঘটেছে। (কারেন্ট বায়োলজি)

মার্চ ৬

*কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পরিবেশ বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন যে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য দায়ী গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করছে প্রায় ৭৫ শতাংশ। একটি প্রতিবেদনে তারা ধান, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের চিরাচরিত প্রক্রিয়াগুলিকে দায়ী করেছেন। তারা বলেছেন, এটা চলতে থাকলে রাষ্ট্রসংঘ নির্ধারিত সময়ের আগেই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্য তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বদলে মিথেন গ্যাসকে দায়ী করেছেন। (দ্য গার্ডিয়ান)

মার্চ ৮

* আমেরিকার লেহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষকের দল বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করার এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। যা বর্তমান প্রযুক্তির তুলনায় তিনগুণ কার্যকরী। গবেষক দলের প্রধান প্রফেসর অরূপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন যে, এই পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করা সম্ভব যাকে খুব সহজেই বাই-কার্বনেট লবনে পরিণত করা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এই পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির মোকাবিলা করা সহজ হবে। এই পদ্ধতিতে এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে আনুমানিক খরচ হবে ১০০ ডলার। (বিবিসি নিউজ)

*সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি বায়ো-ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা টাইপ-১ ডায়াবেটিস-এর মোকাবিলার জন্য কার্যকরী হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। এই রোগে রোগীর শরীরে ইনসুলিন নামক হরমোনের উৎপাদন ব্যাহত হয় ফলে রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমা হতে থাকে যা ধীরে ধীরে শরীরের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র যন্ত্রটি রোগীর চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয়, রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করলেই একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তা ভেঙ্গে গিয়ে শক্তি উৎপাদন করে ও যন্ত্রের মধ্যে রাখা কৃত্রিম অন্ত্র থেকে ইনসুলিন নির্গত হয় যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। (ইটিএইচ জুরিখ)

মার্চ ১০

* ফলের মাছির সাথে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত। সাধারন মাছির থেকে আকারে বেশ ছোট। ধারণা করতে পারেন একটা ছোট্ট মাছির লার্ভার মস্তিষ্কে ৩০১৬টি স্নায়ুকোষ ও ৫৪৮০০০টি সাইন্যাপস থাকে? সাম্প্রতিক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা তেমনটাই জানাচ্ছেন। (সায়েন্স নিউজ)

মার্চ ১৪

* ১৯৮৯ সালে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা দ্বারা প্রেরিত ম্যাগেলান মহাকাশযান-এর তথ্যাবলী শুক্রগ্রহে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে। (নাসা)

মার্চ ২১

* পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহাণু ‘রিয়াগু’ থেকে প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা ইউরাসিল-এর সন্ধান পেয়েছেন। ইউরাসিল হল নিউক্লিক অ্যাসিড তথা প্রাণের অন্যতম উপাদান। (স্কাই এন্ড টেলিস্কোপ)

* তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের একটি দল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টম্যাটো এবং তামাক গাছের উপর পরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেন গাছগুলি একটি বিশেষ ধরনের আল্ট্রাসোনিক শব্দ সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানীরা পীড়িত উদ্ভিদের এই প্রতিক্রিয়াকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের আর্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। (সায়েন্স নিউজ)

এপ্রিল ৬

* স্নায়ুকোষ কিভাবে বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহ করে এবং কিভাবে তা স্নায়ুকোষের কাজের সাথে সম্পর্কিত? স্নায়ু বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে খুবই সামান্য। তবে সম্প্রতি আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর গ্ল্যাডস্টোন ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা গেছে কিভাবে স্নায়ুকোষ গ্লুকোজ ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করে, কিভাবে তড়িৎ-সংকেত পাঠিয়ে কোষের গ্লুকোজ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, কোষের গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেলে কিভাবে নিজেকে অভিযোজিত করে ইত্যাদি। এই গবেষণা পার্কিনসন্স ও অ্যালঝাইমারের মতো জটিল রোগের চিকিৎসায় কাজে আসতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (গ্ল্যাডস্টোন ইন্সটিটিউট)

এপ্রিল ১০

* দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন শহর সম্প্রতি খবরের শিরোনামে এসেছে জল সংকটের কারণে। পুরসভা মাথাপিছু প্রতিদিনের জলের বরাদ্দ ৫০ লিটারে নামিয়ে দিয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে শহরের ১৪ শতাংশ বিত্তশালী শহরের ৫০ শতাংশ জল প্রতিদিন ব্যবহার করে যেখানে ৬২ শতাংশ দরিদ্র ব্যবহার করে মাত্র ২৫ শতাংশ জল। (দ্য গার্ডিয়ান)

*এক ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণের ফলে গমের ফলনে

ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে যা বিশ্বের বহু দেশেই ঘটে থাকে। এই রোগকে হুইট ব্লাস্ট ডিজিজ বলা হয়। এক দেশে সংক্রমণ হলে তা অন্য দেশে খুব দ্রুত ছড়িয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি জিনের সন্ধান পেয়েছেন যা এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। (বায়োলজি)

এপ্রিল ১৮

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার বহির্গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন এবং অসংখ্য বহির্গ্রহের সন্ধান পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু কোনও বহির্গ্রহে প্রাণ আছে কিনা সেটা নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য। বিহর্গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব'র সন্ধান পেতে বিজ্ঞানীরা বর্জন-নীতি প্রয়োগ করার কথা ভাবছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে অতিরিক্ত ধাতুর উপস্থিতি বায়ুমন্ডলে অতি বেগুনী রশ্মির মাত্রা বৃদ্ধি করে যা পক্ষান্তরে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা হ্রাস করে। (ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি)

এপ্রিল ২০

* নাসা ও ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ গবেষণায় উপগ্রহ চিত্র থেকে প্রাপ্ত ডেটা হিসাব করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড ও দক্ষিণ মেরুতে বিশাল পরিমাণ বরফের গলন ঘটেছে। এই গলে যাওয়া বরফের পরিমাণ প্রায় ৮.৩ ট্রিলিয়ন টন। যার ফলে সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধির কারণেই পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশে বন্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (এবিসি নিউজ)

এপ্রিল ২৫

* ডিএনএ'র গঠনের আবিষ্কারক হিসাবে ওয়াটসন ও ক্রিক-এর নাম সবাই জানেন। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে বৃটিশ বিজ্ঞানী রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন ডিএনএ'র এক্স-রশ্মির প্রতিচ্ছবি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ঐ প্রতিচ্ছবি ডিএনএ'র দ্বি-সর্পিল বা ডাবল হেলিক্স গঠন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞানী ওয়াটসন বা ক্রিক কেউই যা স্বীকার করেননি বলে অভিযোগ। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড মার্কেল সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন রোজালিন্ড-এর গবেষণালব্ধ ডেটা তাঁর অনুমতি না নিয়ে ব্যবহার করেছিলেন নোবেল বিজয়ী ওয়াটসন ও ক্রিক। তিনি দাবি করেন ডিএনএ'র গঠনকে 'ওয়াটস-ক্রিক মডেল' না বলে 'ওয়াটসন-ক্রিক-রোজালিন্ড মডেল' বলাই সমীচীন হবে। (নিউইয়র্ক টাইমস)■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

ভারতে এবং বঙ্গভূমিতে আদিম মানুষের পদার্পণ

ভারতে মানুষের পূর্বপুরুষ, হোমো সেপিয়েন্স কবে পদার্পণ করেছে এ নিয়ে নৃতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভূতাত্ত্বিকদের মধ্যে নানা মতবিরোধ আছে। এক দলের মতে ভারতে হোমো সেপিয়েন্স আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আরব পেনিনসুলা অতিক্রম করে মধ্য প্রস্তরযুগে অর্থাৎ আজ থেকে ৭৪,০০০-১,২০,০০০ বছর পূর্বে এদেশের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ভারতে পদার্পণ করে। এই মানুষগুলি ছিল শিকারি এবং খাদ্য সংগ্রহ করত বনজঙ্গল থেকে এবং পোষাক ব্যবহার করত। অপরদিকে অন্য একদল বিজ্ঞানীদের মতে ভারতে আদিম মানুষ হোমো সেপিয়েন্স পদার্পণ করেছে আজ থেকে ৫০,০০০-৬০,০০০ বছর পূর্বের সময়কালে এবং তারা তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করত এবং ধারালো অস্ত্র তির ধনুক ও বর্শা ব্যবহার করত।

ভূতাত্ত্বিকভাবে সংঘটিত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এই দুই ভিন্ন মতের জন্ম দিয়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে আজ থেকে ৭৪,০০০ বছর আগে সুমাত্রার টোবা (Toba) অঞ্চলে এক বিশাল মাপের অগ্ন্যুৎপাত সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশে লক্ষ লক্ষ টন ছাই ও আগ্নেয়গিরিজাত পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রাকৃতিক ঘটনার জেরে এই অঞ্চলের প্রাণীদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। একদল বিজ্ঞানীদের মতে ভারতে হোমো সেপিয়েন্স টোবা অগ্ন্যুৎপাতের পরে পদার্পণ করেছিল।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই আগস্ট মাসে হওয়া দুটি নতুন আবিষ্কার পূর্বেকার বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রথম মতকেই জোরদার করেছে। অর্থাৎ ভারতে আদিম মানুষের পদার্পণ হয়েছে টোবা অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বে।

সুইজারল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রিস ক্লার্কসন গবেষণা করে দেখান যে আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েন্স অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পদাপর্ণ করে আজ থেকে ৫৯,৩০০-৭০,৭০০ বছর পূর্বের সময়কালের মধ্যে। যদি এর মধ্যবর্তী সময়কে নেওয়া যায় তবে তা হয় আজ থেকে ৬৫,০০০ বছর পূর্বে। এই গবেষণা পূর্বের গবেষণালব্ধ সময়কাল থেকে হোমো সেপিয়েন্স এর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পদার্পণকে ১৫,০০০ বছর এগিয়ে দিয়েছে। অধ্যাপক ক্লার্কসন অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের মাদজেদবেবে গুহার মধ্যে আদিম মানুষের ব্যবহার্য হামানদিস্তা, কুঠার এবং দেওয়ালে

আঁকা চিত্র এর বয়সকাল নির্ণয় করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

দ্বিতীয় গবেষণাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে।অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ কিরা ওয়েস্টাওয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাজীববিদ ডঃ জুলিয়েন লোউইস এবং অন্যান্যরা ইন্দোনেশিয়ার লিডা আজের গুহা (সুমাত্রা দ্বীপে অবস্থিত) থেকে পাওয়া মানুষের দুটি দাঁতকে (যা প্রায় ১০০ বছর আগে পাওয়া গেছিল) পুনরায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা তার বয়স নির্ণয় করেন। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় যে এই প্রাচীন মানুষটির দাঁতের বয়স আজ থেকে ৬৩,০০০-৭৩,০০০ বছর প্রাচীন। এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে আধুনিক মানুষ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অন্ততপক্ষে পূর্বের ধারণা থেকে আরও ২০,০০০ বছর আগে পদার্পণ করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ার মাদজেদবেবে এবং সুমাত্রার আজের গুহার সাম্প্রতিক গবেষণায় থেকে যে ফলাফল বেড়িয়ে আসছে তা একই দিকে ধাবিত। অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েন্স এর পদার্পণ আজ থেকে ৬০,০০০ বছরেরও পূর্বে ঘটেছিল।

অর্থাৎ যদি অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আদিম মানুষের (হোমো সেপিয়েন্স) পূর্বপুরুষ আজ থেকে ৬৫,০০০ বছর পূর্বে পদার্পণ করে থাকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে আরব পেনিনসুলা অতিক্রম করে, তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে পূর্ব আফ্রিকা থেকে আরব পেনিনসুলা অতিক্রম করে আদিম মানুষ ভারতে পদার্পণ করেছে এর বহুকাল পূর্বে। অর্থাৎ ভারতে আদিম মানুষের প্রথম পদার্পণ সম্ভবতঃ আজ থেকে ৭৪,০০০-১,২০,০০০ বছর আগেই ঘটেছিল। এছাড়া বিজ্ঞানীরা এই মতও পোষণ করেছেন যে প্রমাণগুলি থেকে (মানুষের শরীরের দাঁত, হাড় ইত্যাদি শক্ত অংশ বা ব্যবহার্য উপাদান) এই বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলিই প্রাচীনতম একথা বলা যায় না। ভবিষ্যতের গবেষণা এই সময়কালকে আরও পিছিয়ে দিতে পারে তবে প্রাচীনত্ব কমার সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞানের এই নতুন গবেষণার গুরুত্ব কোথায়? এর সব থেকে প্রধান গুরুত্ব হল ভারতে মানুষের ইতিহাসের সূচনাকাল জানা। দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্ব হল পূর্ব আফ্রিকা থেকে আরব পেনিনসুলা অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম যে মানুষ এসে বসবাস শুরু করে তারাই হল ভারতীয়দের প্রথম পূর্ব পুরুষ। ভারতীয়দের জিনগত ইতিহাসের অন্তত ৫০-৬০ শতাংশ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। অনেক পরে পশ্চিম এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়া থেকে যে মানুষরা এদেশে এসেছিল তাদের থেকে ভারতের মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্যের বাকি অংশ এসেছে। এছাড়া এই গবেষণা থেকে একথা বিশ্বাস করা অমূলক হবে না যে এদেশের আদিবাসী জনতার (জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ) অধিকাংশ ভারতে প্রথম পদার্পণ করা মানুষদের উত্তরপুরুষ।

ভারতে যে আদিম মানুষ প্রথম পদার্পণ করেছিল তারাই এদেশের মানুষের সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। এদের ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে না পারলে ভারতীয়দের পরবর্তী ইতিহাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

বঙ্গভূমিতে প্রথম আদিম মানুষের পদার্পণ

এ বিষয় প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা প্রায় দেড়শত বছর ধরে গবেষণা করে আসছেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ভ্যালেন্টাইন বল প্রথম এই বিষয় গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে (কুন কুনে অঞ্চল) আদিম মানুষের ব্যবহার্য পদার্থের খোঁজ পান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র স্বাধীনতার পূর্বে তেমনভাবে সংগৃহীত হয়নি। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী, কুমারী এবং জান নদীর তটের পলি থেকে আদিম মানুষের ব্যবহার্য পদার্থ (টুলস) সংগ্রহ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি.বি. লাল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দামোদর নদীর পাড়ে বীরভানপুর অঞ্চলের পলি থেকে মাইক্রোলিথিক টুল (প্রস্তরের হাতিয়ার) আবিষ্কার করেন যা কিনা মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির সাথে মেলে। অধ্যাপক ঘোষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে পাথরের হাতিয়ার আবিস্কার করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক পি. সি. দাশগুপ্ত, অধ্যাপক চক্রবর্তী, এবং এ. দত্ত প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের প্রমাণ এবং তার নিদর্শন চিহ্নিত করেন। অধ্যাপক বসাক এবং তার সহযোগীরা (২০১৪) দেখান যে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা) প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের সভ্যতার নানা স্তরগুলি পাওয়া যায় যার বয়সকাল আজ থেকে ৩৪,০০০-২৫,০০০ বছর প্রাচীন। এগুলি মুখ্যত পাওয়া গেছে ঐ অঞ্চলের নদীগুলির প্রাচীন পলিতে। আদিম মানুষের তৈরি অস্ত্র, বাসন, শিল্পকর্ম, পাথরের হাতিয়ারগুলি যা পাওয়া গেছে তা সবই ঐ সময়কালের। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তুলনায় নবীন যুগের মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রি পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ বঙ্গভূমিতে আদিম মানুষের পদার্পণ ঘটে আজ থেকে অন্তত ৩৪,০০০ বছর পূর্বে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে যা আজও জঙ্গলমহল নামে পরিচিত।■

তথ্যসূত্র ঃ

১) Who are the first settlers of India - www.thehindu.com

২) Evidence of early Man in West Bengal : A Review - Mandrima Biswas

পাঠকের কলম ঃ

চোখ – আমাদের মনের জানালা

– শুভময় দাশগুপ্ত

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত, অপটোমেট্রিস্ট]

বছর তিনেক আগে একটা পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট গল্পে পড়া কয়েকটা লাইন মনের মধ্যে গেঁথে ছিল, “যে জন্মান্ধ, সে জানেনা দৃষ্টির মাহাত্ম। যে বসন্তের শিমুল গাছের লালিমা বা বর্ষার কামিনীর বুক ফেটে টুপ করে দু ফোঁটা জল পড়তে দেখেনি সে জানেনা দৃষ্টি কি জিনিস। তাই তার অভাব অনুভবই করে না। কিন্তু যে জন্মে পৃথিবীর রঙ রূপ দেখে হঠাৎ করে অন্ধ হয়ে যায়, সে জানে দৃষ্টি হারানোর বেদনা আবার যে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরে পেয়েও আবার হারায়, তার কথা নাই বা বললাম।”

এখান থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। আমাদের পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়র মধ্যে প্রথমটা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হল আমাদের দুটো চোখ। আমাদের মাথার সামনের দিকের নাকের দুই পাশে দুই চোখ অবস্থান করে। চোখকে আমরা মনের আয়না বলতে পারি। পৃথিবীতে প্রকৃতির রূপ, রস, সৌন্দর্য আমরা চোখে দেখেই উপলব্ধি করতে পারি। বস্তুত আমাদের কাছের, দূরের মানুষ, পশু পাখি, গাছপালা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, আকাশ, মাঠ ময়দান, ঘরবাড়ি, খাদ্যবস্তু সমস্ত জিনিসই আমরা চোখের মাধ্যমেই দেখে উপলব্ধি করতে পারি। তাদের আকার, রঙ, দুরত্ব সম্পর্কে ধারণার করতে পারি। কোনও আলোকিত বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে পড়লে তা চোখের ভেতরের পর্দায় প্রতিফলিত হয়। সেখান থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে আকার ধারণ করে। তাই আমরা সেই জিনিসটা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আলোর ভূমিকাও অনেকখানি। আমাদের সামনে অন্ধকারের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও চোখ খোলা অবস্থাতেও আমরা তাকে দেখতে পাব না।

একজন জন্মান্ধ মানুষের পৃথিবী সম্পর্কে কোনও ধারণা গড়ে ওঠে না। কানে শুনে অথবা স্পর্শের দ্বারা তারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু অবাক সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষণ করে অসীম আনন্দে আত্মহারা হতে পারেন না তাই তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন এই আনন্দের অংশীদার হতে। কারণ এই আনন্দের কোনও বিকল্প হয় না।

আমাদের দুটো চোখ মুখের ওপর দিকে নাকের দুই দিকে কপালের নিচে অবস্থান করে। প্রচন্ড সুক্ষ্ম, সংবেদনশীল এবং নরম হওয়ার কারণে দুই চোখের জন্মগত কয়েকটা রক্ষাকবচ থাকে। যেমন চোখ দুটো অর্ধগোলাকার হাড়ের গর্তের ভিতর (অরবিট) সুবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। উপরের দিকে চওড়া কপাল, মধ্যে নাক থাকায় হঠাৎ করে আঘাতপ্রাপ্ত হয় না, চোখ দুটো সামনের থেকে যতটা দেখা যায় তার থেকে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বৃহৎ একটা বলের মতো। চোখের পেছনের অংশ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত। যার দ্বারা আলোকিত বস্তু রঙ আকার সহ দৃশ্যগোচর হয়। দুই চোখের সাদা অংশের মাঝখানটা অর্ধগোলকের আকারে একটু উঁচু হয়ে আছে। যাকে আমরা কর্নিয়া বা চোখের মণি বলে থাকি। এই কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে আলোকিত বস্তু থেকে আলো চোখের মধ্যে প্রবেশ করে। কর্নিয়া একদম পরিস্কার কাঁচের মতো স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছতার ওপর আমাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কোনও কারণে স্বচ্ছতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে আলো কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ থেকে অস্বচ্ছতর হতে থাকবে। কর্নিয়া পেশী তন্তু দিয়ে গঠিত নয়। এতে রক্তনালীও নেই, তাই স্বচ্ছ। আঘাত বা সংক্রমণের ফলে কর্নিয়ার কোনও অংশ সম্পূর্ণ বা অংশত ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্নিয়ার স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কর্নিয়া আর ঠিক করা যায় না। মানুষ অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যায়। কোনও কৃত্রিম কর্নিয়া মানুষ এখনও তৈরি করে উঠতে পারে নি। একমাত্র কোনও মানুষ তার কর্নিয়া দান করলে তবে তা প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু একমাত্র মৃত মানুষের থেকেই কর্নিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব। জীবিত মানুষের কর্নিয়া দান করার কোনও সংস্থান নেই। মানুষের চক্ষু গোলোকের নানা সমস্যায় মানুষ দৃষ্টিহীন হতে পারে। কিন্তু একমাত্র কর্নিয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেই চক্ষু বা কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। মানুষের মৃত্যুর পরে তার নিকটজনেরা মৃত প্রিয়জনের চোখ দুটো দান করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আগে থেকে অর্থাৎ জীবিত থাকাকালীন অঙ্গীকার করে রাখার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। এতে বহু মানুষ দৃষ্টি ফিরে পেতে পারেন। মানুষ মৃত্যুর পরে অন্যের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকতে পারেন।

আমরা জানি, চক্ষুদান সমাজে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের চোখের কর্নিয়া বা মণির একটা বিশেষত্ব হল শৈশব থেকে আমৃত্যু তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। বয়সজনিত পরিবর্তন বেশি হয় না। কর্নিয়াতে যেহেতু রক্তনালী নেই তাই প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রুপ নির্ণয়ের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপে ভোগা মানুষের এমনকি ছানি অপারেশন করা মানুষের কর্নিয়া স্বচ্ছন্দে প্রতিস্থাপন করা যায়। তাই আঘাত বা সংক্রমণের দ্বারা নষ্ট না হয়ে গেলে যে কোনও বয়সী মানুষের কর্নিয়া সব বয়সী মানুষের ক্ষেত্রেই উপযোগী থাকে। মৃতদেহের চক্ষু গ্রহণ করার জন্য সরকারি বেসরকারি অনেক চক্ষু গ্রহণ কেন্দ্র (EYE BANK) আছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমেও চক্ষু ব্যাঙ্কের ঠিকানা ও ফোন নম্বর সহজে জোগাড় করা যায়। মানুষের

মৃত্যুর পর দূরভাষের মাধ্যমে তাদের অবহিত করলে প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সের টিম এসে চোখ দুটি গ্রহণ করে নিয়ে যেতে পারে। তবে মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যেহেতু তা সংগ্রহ করতে হয় তাই যত দ্রুত সম্ভব আই ব্যাঙ্কে খবর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। চক্ষু দানের ক্ষেত্রে যেটা করা প্রয়োজন সেটা হল মৃত মানুষটিকে চিত করে শুইয়ে রাখতে হবে। পরিস্কার তুলো জলে ভিজিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রাখতে হবে। সম্ভব হলে কোনও এন্টিবায়োটিক আই ড্রপ দেওয়া যেতে পারে। কোনোভাবেই তুলসী পাতা, চন্দন এসব ব্যবহার করা যাবে না। আই ব্যাঙ্কের দল এসে সুচারু অবস্থায় চক্ষু গোলক দুটি সংগ্রহ করে সেই স্থানে কৃত্রিম চক্ষু বসিয়ে দেবেন। কোনও বিকৃতি হবে না। চোখের সমগ্র অংশের মধ্যে শুধুমাত্র কর্নিয়াই প্রতিস্থাপন যোগ্য। বাকি অংশ মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন, "... জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ...।" মৃত্যুর পরেও মানুষের বেঁচে থাকার উপায় মানুষের কর্ম। মানুষের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ। চক্ষুদান সেরকমই একটা মহান উদ্যোগ যা অন্য কয়েকজনকে দৃষ্টি দান করে। যদি কোনও মানুষের চোখের কর্নিয়ার সামগ্রিক ক্ষতি হয় তবে সম্পূর্ণ কর্নিয়া প্রতিস্থাপন যোগ্য। দুটো চোখ দুজন মানুষকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে। আবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত কর্নিয়া মেরামত করতে হলে কর্নিয়া কয়েকটি টুকরো করে একেকটি অংশ একেক জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি চোখের ব্যবহারে বেশ কয়েকজন মানুষের আরোগ্য লাভ হতে পারে।

সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বহু বছর চাকরি করার সুবাদে চক্ষুদানের ক্ষেত্রে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। যেমন –

১) অনেক মানুষের মধ্যে ধারণা আছে যে মৃতদেহ থেকে চোখ দুটো বাদ গেলে পরের জন্মে তিনি অন্ধ হয়ে জন্ম নেবেন। যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই।

২) কোনও মানুষের হঠাৎ মৃত্যু হলে বাড়ির লোকজন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন সকলকে খবর দেওয়া, সৎকারের ব্যবস্থা, মৃতের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল পরিজনদের আর্থিক চিন্তা ইত্যাদি প্রধান হয়ে ওঠে। চক্ষুদানের কথা অনেকেই ভুলে যান।

৩) এমনও দেখা গেছে, চক্ষুদানের অঙ্গীকার করা মানুষের চক্ষু সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিজনদের আক্রমণের মুখে পড়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে। তাছাড়া পরিজনদের মধ্যে দ্বিমতের ফলে চক্ষু সংগ্রহে অসুবিধা হয়।

৪) সরকারি আই ব্যাঙ্কগুলোতে গাফিলতিও বিদ্যমান। রাতে ফোন বেজে যায়। সাধারণত কেউ ধরেন না। ধরলেও বলে অফিস টাইমে যোগাযোগ করতে।

৫) আই ব্যাংকগুলো সবই শহরাঞ্চলের কোনও না কোনও হাসপাতালের সাথে যুক্ত। গ্রামের দিকে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে চোখ সংগ্রহের বস্তুত কোনও ব্যবস্থাই নেই।

সবশেষে বলি, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, "সকলের দুটো চোখ আছে তবে সবার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এক নয়।" তাই বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনার প্রচার ও প্রসারে মধ্য দিয়ে চক্ষুদানের একটা সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি সরকারকে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। চক্ষুদানে উৎসাহ প্রদান এবং এই বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার সমাজে বিদ্যমান তা কাটানোর জন্য অনেক বেশি প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে। এবং পাশাপাশি পরিকাঠামোর আরও উন্নতি করতে হবে। চক্ষুদানের ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই যে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তাদের আত্মীয়দের আগে থেকে কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উপস্থিত কোনও অগ্রসর চিন্তাভাবনার পরিজন এই কাজ করতে পারেন।

চোখ আমাদের মনের জানালা। এই জানালা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকুক।■

পাঠকের কলাম ঃ

নিকোলা টেসলা স্মরণে

– রোহিত প্রামাণিক

আজ যে পৃথিবীকে আলোকময় দেখছি, এই আলোকময়তার পিছনে বিদ্যুতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদ্যুৎ না থাকলে আজ গোটা পৃথিবী অচল হয়ে পড়বে। তাই এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা সকলের জানা উচিৎ। চাকা আবিষ্কার যেমন গোটা সমাজকে দ্রুত গতিশীল করেছে, তেমনই বর্তমান সমাজকে যুগান্তকারী আলোকময় করেছে নিকোলা টেসলার আবিষ্কার। তাঁর মহান আবিষ্কার হল পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ বা অল্টারনেটিং কারেন্ট। এই তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্কারের ফলে আমাদের সমাজ আলোকময় হয়ে উঠেছে। তাই এই মহান আবিষ্কারের স্রষ্ঠা সম্পর্কে আসুন জানা যাক।

এই মহান বিজ্ঞানী ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই বর্তমান ক্রোয়েশিয়া নামক দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধর্মগুরু আর তাঁর মা ছিলেন ঘরোয়া মানুষ। তাঁর প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় সিমিলজানের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তিনি জার্মান ভাষা, গণিত এবং ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ শিক্ষাগ্রহণের পর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মনে মনেই জটিল গণিতের

সমাধান করতে পারতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের এক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের তড়িৎ প্রদর্শনী দেখে এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সে সময় তাঁর মেধা দেখে শিক্ষকরা অবাক হতেন। তিনি চার বছরের পাঠ্যসূচি মাত্র তিন বছরে শেষ করে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু তখনও তাঁর তড়িৎ সম্পর্কে আগ্রহটা রয়ে গেছে।

তাঁর বাবা তাঁকে ধর্মগুরু বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন বাবার কাছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বাবা রাজি হলেন না। পরবর্তীকালে তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে মত দেন।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বৃত্তি পেয়ে তিনি পলিটেকনিকে ভর্তি হন। প্রথম বছরে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। যখন তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, তখন বাবা মারা যান। দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়, পড়াশোনার খরচ চালাতে অসুবিধা হয়। এই সময় তিনি জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েন। তৃতীয় বর্ষে কলেজে আর ভর্তিই হতে পারলেন না। কিন্তু এসবের মাঝে বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসাটা থেকেই যায়।

জীবনের এই নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসতে তিনি কর্মজীবনে পা দেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং পড়াশুনোটা নিজের মতো করে অব্যাহত রাখেন। তিনি একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু করেন একজন ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে। এখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরের বছর ফ্রান্সে এডিশনের কোম্পানিতে কাজ নেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পদার্থ বিজ্ঞানে অপরিসীম জ্ঞান থাকায় তিনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যান। তাঁকে ডায়নামো ও মোটর ডিজাইন করতে দেওয়া হয়। একাজে তিনি প্রতিশ্রুতি মতো পাঁচ হাজার ডলার পাবেন ঠিক ছিল, কিন্তু কৃতকার্য হওয়ার পর সেটা না পাওয়ায় এডিসনের সাথে কাজ বন্ধ করেন। তিনি রবার্ট লেন এবং বেঞ্জামিন ডেইল নামক দু'জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও তাদের কাজে যোগদান করেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষে তিনি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সুপারিনটেনডেন্ট-এর সাথে যোগাযোগ করেন। এখানে ডায়নামো নিয়ে কাজ শুরু করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এসি কারেন্ট অর্থাৎ অলটারনেটিং কারেন্ট দ্বারা পরিচালিত ইন্ডাকশন মোটর তৈরি করেন এবং পাশাপাশি এসি ডায়নামো তৈরি করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে এক প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর এসি মোটর প্রদর্শনীর সুযোগ পান। প্রতিযোগিতায় থমাস এডিসনের ডিসি মোটরকে তিনি পরাজিত করেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যারিসে ছিলেন। সেখানে হেইনরি হার্টজ এর পরীক্ষা দেখে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ও রেডিও ওয়েভ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। তারপর তিনি একরকম কয়েল তৈরি করেন যাকে পরবর্তীকালে টেসলা কয়েল বলা হয়। এই কয়েল ও অল্টারনেটিং কারেন্টের মাধ্যমে ওয়ারলেস বা বেতার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রযুক্তির উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ইন্সটিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তাঁকে সহকারী সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনে একটা খারাপ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর পরীক্ষাগারে আগুন লেগে যায়। ফলে তাঁর অনেক গবেষণাপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তিনি খানিকটা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু এই সকল ঘটনা তাঁকে দুর্বল করলেও, স্বপ্রচেষ্টায়, প্রচন্ড একাগ্র ও একগুয়েমিতার মধ্য দিয়ে তা কাটিয়ে ওঠেন। তারপর টেসলা থেমে থাকেন নি, রন্তজেন এক্স-রে আবিষ্কার করার আগেই টেসলা তাঁর গবেষণাগারের মধ্যেই অজান্তেই গবেষণা করতে করতে এক্স-রে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বলে শোনা যায়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি রেডিও ওয়েব নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র তৈরি করেন, যা টেলিকমিউনিকেশনের কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলোরাডোতে চলে আসেন এবং পরে তিনি উচ্চ স্পন্দন এবং উচ্চ ভোল্টেজ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি বাটন ল্যাম্প, ডেথ রে, প্লাজমা গ্লোব, প্লাজমা ল্যাম্প, টেলি অপারেশন এবং তড়িৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়ারলেস সিস্টেম তৈরি করেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী নিউ ইয়র্কের এক হোটেলে ৮৬ বছর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। তাঁকে মনে রাখতে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (এসআই ইউনিট) অনুযায়ী চুম্বক আবেশের একক-কে টেসলা নামে করা হয়। তাঁর আবিষ্কৃত এসি কারেন্ট সমাজে বিপ্লব এনেছিল।

ভালো করে ইতিহাসের আবিষ্কারের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রাচীনকাল থেকেই এক একটা আবিষ্কার সমাজে বিপ্লব এনে দেয়। যেমন প্রাচীনকালে আগুন থেকে শুরু করে চাকা আবিষ্কার, স্টিম ইঞ্জিন, তারপর ইলেকট্রিক এবং বর্তমান সমাজে ইন্টারনেট।

এসি কারেন্টের আবিষ্কারক যে তাঁর আবিষ্কারের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে আধুনিক করে তুলেছিলেন, প্রতিটা বিজ্ঞান প্রেমী এবং বিজ্ঞানমনস্কদের তা স্মরণ করা উচিৎ।■

চিঠিপত্র ঃ

আমি এই পত্রিকার একজন পাঠক। গত বছর বেহালার একটি বইমেলা থেকে প্রথমবার পত্রিকা কিনেছিলাম। আপনাদের পত্রিকার লেখার গুণমান খুবই ভালো এবং বিষয়বস্তুও সুন্দর। গত মার্চ ২০২৩-এর সংখ্যাটিতে বৈজ্ঞানিক খবর, পরিবেশ সংক্রান্ত লেখা এবং কৃষকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই নির্ভুল তথ্য জানতে পেরেছি। বিনা বিজ্ঞাপণে ছাপানোর জন্য এবং ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য উপযুক্ত বিষয় থাকায় আমি পত্রিকাটি পছন্দ করি। – শুভ্র সরদার

মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ

মানুষ কী করে প্রথম ব্ল্যাকহোলের খোঁজ পেল

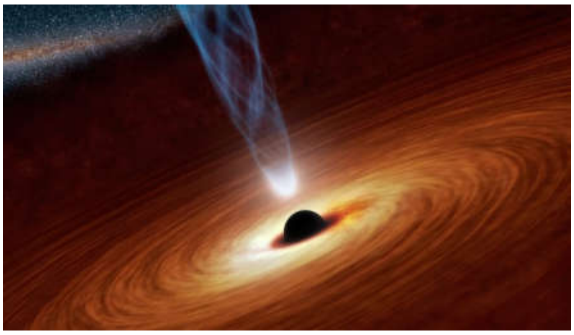

ব্ল্যাকহোল তার আশপাশের বস্তু, এমনকি আলোক রশ্মিকেও গ্রাস করে নেয়। সমীক্ষণের আগের সংখ্যায় – মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ ব্ল্যাকহোল – এই ধারাবাহিক নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে এ বিষয় আলোচনা হয়েছিল। সেখানে আমরা দেখেছিলাম স্থান-কালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ত্রিমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল নিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব চতুর্মাত্রিক। আমরা যেহেতু স্থানে ত্রিমাত্রাকে অনুধাবন করতে পারলেও চতুর্মাত্রাকে অনুধাবন করতে পারি না; তাই তাকে বুঝতে গেলে গোলীয় তলের জ্যামিতি আর আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিতে হয়। গোলীয় তলের জ্যামিতির জটিল ব্যাখ্যায় আমরা না গিয়ে ত্রিমাত্রিক স্থানের তিনটি মাত্রার কেবলমাত্র একটি মাত্রা এবং সময়ের মাত্রা, অর্থাৎ এই দ্বিমাত্রিক তল দিয়ে স্থান-কালের চতুর্মাত্রাকে অতি সরলীকরণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম।

এবং দেখেছিলাম, স্থান-কালের বক্রতায় ভরহীন আলোকরশ্মিও বেঁকে যেতে পারে; সময়ের গতিও সেখানে পরিবর্তন হয়। স্থান-কালের এমন একটা বক্রতা (শোয়ারশিল্ড রেডিয়াসে) পাওয়া যায়, যার মধ্যে কোন বস্তু এসে পড়লে সে আর মুক্তি পায় না। এটাই ব্ল্যাকহোলের সীমানা বা আকার; যাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন (Event Horizon)।

ইভেন্ট হরাইজন অতিক্রম করে যদি ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রে যাওয়া যায়, যেখানে অতি ক্ষুদ্র স্থানে বিশাল ভর কেন্দ্রীভূত থাকে। ঘনত্ব তাই সেখানে অসীম। গণিতের ভাষায় এই কেন্দ্র বিন্দুকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি (Singularity)। এটা একটি গাণিতিক ধারণা। এখানে বস্তুসমূহ ঠিক কী অবস্থায় থাকে – আজও বিজ্ঞানীদের অজানা। যাই হোক, সকল বস্তু এমনকি আলোক রশ্মিও ইভেন্ট হরাইজন অতিক্রম করলে বিলীন হয়ে যায়। সময়ও সেখানে থেমে যায়। অর্থাৎ কোনো সংকেতই ব্ল্যাকহোল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারে না। তাই ব্ল্যাকহোল কালো-অন্ধকার দেখায় – ব্ল্যাকহোল দেখা যায় না; ব্ল্যাকহোল অদৃশ্য।

ব্ল্যাকহোল যদি দেখাই না যাবে, কোনো সংকেতই যদি ব্ল্যাকহোল না দেয়; তাহলে বিজ্ঞানীরা কী করে এর খোঁজ পেলেন?

মনে করুন, বিশ্বখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসি এলেন মোহনবাগান ক্লাবে। আপনি ক্লাবের বাইরের পরিবেশ অর্থাৎ হাই সিকিউরিটি, কর্তৃপক্ষের সতর্কতা, ব্যস্ত-কর্মকান্ড দেখে কি সহজেই অনুমান করতে পারবেন না যে, ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটছে? ঠিক তেমনি ব্ল্যাকহোলের চারপাশের পরিবেশ থেকেই ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

ব্ল্যাকহোল তার নিকটবর্তী বস্তুসমূহকে আকর্ষণ করে। এমনকি কোনো স্টার নিকট আওতায় এলেও তার অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্ল্যাকহোলের দিকে ধাবিত হতে থাকে। যেমন গ্যাস-ডাস্ট ইত্যাদি। এগুলি যতই ব্ল্যাকহোলের নিকটবর্তী হতে থাকে, ততই তাদের উষ্ণতা, উজ্জ্বলতা, গতিবেগ বাড়তে থাকে এবং ইভেন্ট হরাইজনের চারদিকে ঘুরতে থাকে – একটি ডিস্কের আকারে। রান্নাঘরের সিংকে (Sink) একবালতি জল ঢেলে দিন, দেখবেন ছিদ্রপথে জল দ্রুত বেড়িয়ে যাবার সময় উপরে একটা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয় – এটা অনেকটা তেমন। এই ঘূর্ণন ডিস্ককে বলা হয় অ্যাক্রেশন ডিস্ক (Accretion Disk)। অ্যাক্রেশন ডিস্কের উত্তপ্ত গ্যাস ও ডাস্ট আলোর প্রায় ৫০ ভাগ গতিবেগে ঘুরতে থাকে। ফলে কণায়-কণায় সংঘর্ষ হয়। উষ্ণতা উঠে যায় মিলিয়ন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেডে। নির্গত হতে থাকে উচ্চশক্তি সম্পন্ন এক্স-রে। এদের লক্ষ্য করেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন ব্ল্যাকহোল। এমনকি তার ভরও নির্ণয় করতে পেরেছেন।

কিন্তু এই খোঁজার প্রয়াসটা বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিনের। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের একটি ক্ষুদ্র অংশ (প্রায় ০.০০৩৫%) হল দৃশ্যমান আলো – আমরা যাকে খালি চোখে দেখতে পাই। কিন্তু এই দৃশ্যমান আলোর চেয়ে বেশি বা কম ফ্রিকোয়েন্সির আলোকে আমরা দেখতে পাই না। ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক হল এক সেকেন্ডে যতগুলি তরঙ্গ অতিক্রম করে। যেমন – বেশি ফ্রিকোয়েন্সির দিকে আলট্রা-ভায়োলেট রে (UV-ray), এক্স-রে (X-ray), গামা-রে; আর কম ফ্রিকোয়েন্সির দিকে ইনফ্রারেড, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি। এরা সকলেই অদৃশ্য আলোক তরঙ্গ। যেহেতু খালি চোখে দেখা যায় না, তাই ব্ল্যাকহোলের অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে নির্গত এক্স-রে এতদিন বিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু উপযুক্ত টেলিস্কোপে এদের দেখা যেতে পারে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও ওয়েভ ও এক্স-রে’র মাধ্যমে ডিপ স্পেস দেখতে শুরু করেন। তাদের নজরে আসে উচ্চশক্তি সম্পন্ন এক্স-রে’র কতগুলি উৎস। কিন্তু

➔

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব পঞ্চম অংশ)

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে একশো বছরে যে সমস্ত অঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছিল, সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পুঁজিপতিরা নিজেদের পারিবারিক ভোগ বিলাসের পর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পুঁজিকে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির উন্নতিকরণে ব্যবহার করেছিল। যাতে কিনা উন্নত প্রযুক্তি ও তার ফলস্বরূপ উন্নত যন্ত্রপাতি থেকে আগের তুলনায় অনেকগুণ বেশি উৎপাদন হয়। তারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গেছিল কাঁচামালের সন্ধানে। সেই কাঁচামাল উত্তোলন, আহরণ এবং পরিবহন ক্ষেত্রেও তাই বিপুল বিকাশ হয়েছিল। এই কাজ সম্পদের মালিক পুঁজিপতিরা করেছিল কেবলমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এর জনজীবনে প্রভাব ছিল বহুদূর বিস্তৃত। শ্রমজীবীদের মেহনতের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সম্পদ যে সামাজিক চেতনার জন্ম দিল, তা হল মানব সমাজের উন্নত জীবন বোধ। কিন্তু এই সম্পদ একটা বড় অংশের মানুষকে নিঃস্ব, রিক্ত করেই সৃষ্টি হয়েছিল। তাই একদিকে মুষ্টিমেয়র হাতে সম্পদের প্রাচুর্য, অন্যদিকে নিঃস্ব শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজ বিভাজিত হয়ে গেছিল। বিশেষ করে পুঁজিবাদ যেখানে বিকশিত হয়েছিল, সেখানে সামাজিক সম্পদের এই সৃষ্টি ও বিকাশ কি করে সমাজে বিভাজন আনে, তার বিজ্ঞানের জন্মের বিষয়ে আমরা আগামীতে আলোচনা করবো। কারণ এই বিজ্ঞানেরও জন্ম হয়েছে মানুষের নিরন্তর প্রকৃতিকে অন্বেষণেরই ফলে। আমাদের এই পর্বে আলোচনার সীমানা রসায়ন বিজ্ঞান। কাঁচামাল-যন্ত্রপাতি থেকে উৎপন্ন বস্তু, সবকিছুই রাসায়নিক পদার্থ। এই একশো বছরে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলির কিছু এখানে রাখা হল।

স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে এই পর্বের আলোচনা আগেই শুরু হয়েছিল। স্টীম ইঞ্জিনের পর ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে পারদ থার্মোমিটার উদ্ভাবন করলেন ড্যানিয়েল ফারেনহাইট। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ংক্রিয় উলবোনার যন্ত্রে ব্যবহার হওয়া ফ্লাইঙ্গ শার্টল্‌ উদ্ভাবন করলেন এক ইংরেজ জন কে। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্টিফেন হলেস উদ্ভাবন করলেন রক্তচাপ মাপার ইন্সট্রুমেন্ট। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন উদ্ভাবন করলেন ঘর গরম করার ফ্র্যাঙ্কলিন স্টোভ। ঐ বছরই উচ্চমানের স্টিল তৈরির পদ্ধতির আবিষ্কার করেন এক ইংরেজ

➔

●*মানুষ কী করে প্রথম ব্ল্যাকহোলের খোঁজ পেল*

তখনও তারা ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব টের পাননি।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পল মার্ডিন (Paul Mardin) লক্ষ্য করেন দুটি বিশেষ স্টার গ্রাভিটির দ্বারা যুক্ত থেকে ঘুরছে (বাইনারি স্টার) – যাদের মধ্যে একটিমাত্র স্টার দেখা যাচ্ছে – অন্যটি দেখা যাচ্ছে না। অদৃশ্য স্টারটির স্থান থেকে শুধু এক্স-রে নির্গত হচ্ছে।

পল মার্ডিন অঙ্ক কষে দেখেন – স্টারটির ভর সূর্যের ভরের ৩ গুণের বেশি হলে সেটি ব্ল্যাকহোল হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখি – বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর (Subrahmanyan Chandrasehkar) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইনস্টাইনের বিশিষ্ট অপেক্ষবাদ এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নীতি ব্যবহার করে দেখান যে, কোন শীতল স্টারের (জ্বালানী প্রায় ফুরিয়ে গেছে এমন স্টারের) ভর সূর্যের ভরের ১.৪৪ গুণের বেশি হলে তার পরিণতি নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাকহোল; যাকে চন্দ্রশেখর লিমিট বলা হয়। পল মার্ডিন এক্ষেত্রে অদৃশ্য স্টারটির ভর হিসেব করে বের করেন – সূর্যর ভরের প্রায় ৫ থেকে ৬ গুণ। তিনি দাবি করেন – এটি সম্ভবত একটি ব্ল্যাকহোল।

কিন্তু অদৃশ্য স্টারটির সঠিক ভর নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা। তাহলেই জোহান কেপলারের সূত্র ব্যবহার করে ভর নির্ণয় করা সম্ভব। তাই পল মার্ডিনের নির্ণয় করা ভর – অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সন্দেহ ছিল। তাই এটাকে ব্ল্যাকহোল হিসেবে বিজ্ঞানীরা মেনে নিতে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এই সন্দেহ অবসান হতে পরবর্তী ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্যারাল্যাক্স পদ্ধতিতে অদৃশ্য স্টারটির দূরত্ব পাওয়া যায় ৬০০০ লাইট ইয়ার। স্টারটির ভর হিসেব করে পাওয়া গেলে ১৫ সোলার মাস – অর্থাৎ সূর্যের ভরের ১৫ গুণ। এবার সবাই নিশ্চিত হলেন অদৃশ্য স্টারটি আসলে একটি ব্ল্যাকহোল।

ব্ল্যাকহোলটির নাম দেওয়া হয় সিগনেস এক্স-ওয়ান (Cygnus X-1)। এটিই হল মানুষের ডিটেক্ট করা প্রথম ব্ল্যাকহোল।

বিজ্ঞান তো এভাবেই প্রশ্ন তোলে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করে সত্যে উপনীত হয়। সেখান থেকে আবার অধিকতর সত্যের খোঁজে বিজ্ঞানের চিরন্তন যাত্রা চলতে থাকে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আধুনিক কারিগরির সাহায্যে সিগনেস এক্স-ওয়ান-এর দূরত্ব আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা হয়। সূর্য থেকে এই দূরত্ব পাওয়া যায় ৬০৭০ লাইট ইয়ার, ভর প্রায় ২১ সোলার মাস এবং এর ইভেন্ট হরাইজনের ব্যাসার্ধ প্রায় ৪৪ কিলোমিটার।■

ঘড়ি প্রস্তুতকারী বেঞ্জামিন হান্টসম্যান। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে তামার উপর রূপার প্লেটিং পদ্ধতির আবিষ্কার হয় ইংলন্ডে, উন্নতমানের ব্লাস্টফারনেসের জন্ম দেন জন স্টিয়াটন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানী জোসেফ ব্ল্যাক পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে ব্যয়িত লীনতাপ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান এ সময় উষ্ণতার পরিবর্তন হচ্ছে না। ঐ বছর জন হ্যারিসন নামের এক ব্রিটিশ ঘড়ি প্রস্তুতকারী একটি ক্রনমিটার বানালেন, যার সাহায্যে সমুদ্র যাত্রায় পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত নিখুঁত দ্রাঘিমারেখা নির্ণয় সম্ভব হল। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়াট উন্নতমানের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রস্তুত করলেন। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হল প্রথম কারখানার। এই কারখানার উদ্ভব হয়েছিল গিল্ড বা কর্মশালা থেকে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পণ্য হিসেবে বাজারে আসে কার্বনেটেড নরম পানীয় সোডা ওয়াটার। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে গভীর খনন যন্ত্র ব্রিটিশ লৌহবিশারদ জন উইলকিনসন উদ্ভাবন করলেন। খনন শিল্পে এই উদ্ভাবন অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মাটির গভীরে থাকা অজানা আকরিকের সন্ধান সম্ভব হল। এই বছরই উদ্ভিদের স্বালোকসংশ্লেষ আবিষ্কার করলেন জ্যান ইনজেনহাউস (Jan Ingenhousz) নামক এক ডাচ চিকিৎসক। মাটির তলার জল ও বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়াই হল স্বালোকসংশ্লেষণ। এই বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস সূর্যালোক। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আলোক শক্তির প্রভাব সম্পর্কে মানুষ কিন্তু অবহিত হয়ে গেছিল। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে একশো ফুট লম্বা লোহার সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছিল ইংলন্ডে। এই সেতু আজকেও ব্যবহার যোগ্য। এই বছরই স্যামুয়েল ক্রমপটন উদ্ভাবন করলেন মিউল স্পিনিং মেশিন, পিগ আয়রনকে রট আয়রনে রূপান্তরিত করার পদ্ধতির আবিষ্কার হল ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে। যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্ম হল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে চলল প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্যাস বাতির জন্ম হল ইংলন্ডে, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লেদ মেশিনের জন্ম দিলেন হেনরি মাউন্ডসলে নামের এক ইংরেজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড উইলকিনসন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে হামফ্রে ডেভি আবিষ্কার করলেন লাফিং গ্যাস নাইট্রাস অক্সাইড, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে অ্যালেসান্দ্রো ভোল্টা আবিষ্কার করলেন ব্যাটারি এবং ঐ বছরই তড়িৎ বিশ্লেষণ আবিষ্কার হল।

যে উদাহরণগুলি এই একশো বছরের ইতিহাস থেকে তুলে ধরা হল, তার বেশির ভাগটাই শিল্প বিপ্লবের আঁতুরঘর ইংলন্ডের। বাকি অধিকাংশ ইউরোপ এবং শিল্প বিকাশের অন্যতম উন্নত ক্ষেত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পুঁজিপতিদের কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কয়লা-লোহাই শুধু নয়, সব রকম মৌলগুলির অনুসন্ধান কাজ গতি লাভ করলো। প্রাচীনকাল থেকে জানা মৌলগুলি ছিল কার্বন (যেমন কয়লা, চারকোল ইত্যাদি), গন্ধক বা সালফার, সোনা, তামা, লোহা, সীসা বা লেড, টিন, রূপা এবং পারদ। মধ্যযুগে আবিষ্কার হয় ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, দস্তা বা জিঙ্ক। এর মধ্যে কেবলমাত্র ফসফরাস আবিষ্কারের বছরটা জানা গেছে। তাহল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ। পুঁজিবাদের আগমনের আগে ও পরে মানুষের আবিষ্কৃত মৌলগুলির একটি তালিকা আমরা দ. ম. ত্রিফোনভ এবং ভ. দ. ত্রিফোনভ লিখিত বই ‘রাসায়নিক মৌল – কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল’ থেকে তুলে ধরছি। এই বইটিতে বিস্তৃতরূপে জানার সুযোগ রয়েছে মানুষের দ্বারা আবিষ্কার হওয়া মৌলগুলির ইতিহাস। এই মৌলগুলির মধ্যকার অনেকগুলোই মৌলিক পদার্থরূপেই প্রকৃতিতে বিদ্যমান। যেমন বাতাসে উপস্থিত গ্যাসগুলির মধ্যকার মৌলিক পদার্থগুলি (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন) বা কার্বন, সালফার, তামা ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ মৌলকেই আকরিক থেকে রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা নিষ্কাশন করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোবাল্ট (Co) মৌলটিকে আকরিক থেকে নিষ্কাসিত করেন সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী ডবলু. ব্রান্ডট। এভাবে আকরিক থেকে মৌল নিষ্কাসনের নতুনভাবে যাত্রা শুরু হয় পুঁজিবাদের যুগে। বাতাসে উপস্থিত মৌলিক গ্যাসগুলির আবিষ্কারও শুরু হয় এর পর (যেমন ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হাইড্রোজেন, ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরিন, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নাইট্রোজেন, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সিজেন ইত্যাদি)। এর ফলে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে সালোকসংশ্লেষ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

১৭৫০ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নতুন মৌলসমূহের আবিষ্কারের সময়কাল

বছর	আবিষ্কৃত মৌলসমূহ	জানা মোট মৌল
১৭৫০ এর পূর্বে	16 (C, P, S, Fe, Co, Cu, Zn, As, Ag, Sn, Sb, Pt, Au, Hg, Pb, Bi)	16
১৭৫১-১৭৭৫	8 (H, N, O, F, Cl, Mn, Ni, Ba)	24
১৭৭৬-১৮০০	10 (Be, Ti, Cr, Y, Zr, Mo, Te, W, U, Sr)	34
১৮০১-১৮২৫	18 (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Se, Nb, Rh, Pd, Cd, I, Ce, Ta, Os, Ir)	52
১৮২৬-১৮৫০	7 (V, Br, Ru, La, Tb, Er, Th)	59
১৮৫১-১৮৭৫	5 (Rb, In, Cs, Tl, Ga)	64
১৮৭৬-১৯০০	19 (He, Ne, Ar, Sc, Ge, Kr, Xe, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Ho, Tu, Yb, Po, Ra, Ac, Rn)	83
১৯০১-১৯২৫	5 (Eu, Lu, Hf, Re, Pa)	88

আমরা বিগত সংখ্যায় আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদাতা ল্যাভয়সিয়ের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলাম রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে নিখুঁত পরিমাপের বিষয়ে তিনি কি পরিমাণ যত্নবান ছিলেন। রসায়ন বিজ্ঞানীরা, যাঁরা আকরিক থেকে মৌলিক

পদার্থগুলিকে নিষ্কাশনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, তাঁরা কিন্তু সকলে এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। ল্যাভয়সিয়ের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন যে রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে বিক্রিয়ক পদার্থের মোট ভর, বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট ভরের সমান হবে। এটা এই যুগে কোবাল্ট আবিষ্কারকারী ডবলু. ব্রান্ডট-এরও জানা ছিল না। তাঁর মতো মৌলিক গ্যাসগুলির আবিষ্কর্তাদেরও এই জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তা হলেও ঐ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলগুলি এক একটা মৌলের আবিষ্কার রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ল্যাভয়সিয়ের পর থেকে রসায়ন বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময়ে একেবারে নিখুঁত পরিমাপ করে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের পরিমাণ হিসাব করা শুরু করে দেন। তাঁরা প্রধানত জিঙ্ক, টিন, লোহার সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়াকে নজর করছিলেন। অ্যাসিডের বিপরীতে ক্ষারগুলির রাসায়নিক ধর্মও তারা নির্ধারণ করেছিলেন। এগুলো ডাই-এর রং বিপরীতরূপে পাল্টে দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যাসিড দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় এমন পদার্থ তৈরি করে যা না অ্যাসিড – না ক্ষার। তৈরি হওয়া পদার্থ স্বাদে নোনতা যা সাধারণত অ্যাসিড ও ক্ষারের মধ্যবর্তী।

আমরা যে একশো বছরের কর্মকান্ড দিয়ে আলোচনা শুরু করেছি (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), তার দশভাগের নয়ভাগই চলে গেছিল মৌলগুলিকে আকরিক থেকে নিষ্কাশনে, মৌলিক গ্যাসগুলির আবিষ্কারে, অ্যাসিড-ক্ষারের মতো বিপরীত চরিত্রের ও ধাতু-অধাতুর মতো বিপরীত চরিত্রের পদার্থগুলির সনাক্তকরণে। কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানে, অর্থাৎ যে নিয়মে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলো হচ্ছে, সে বিষয়ে গবেষণা হয়েছে শেষ দশভাগের একভাগ সময়ে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী জেরামিয়াম বেঞ্জামিন রিখটার নির্দিষ্ট ভারের একটি বিক্রিয়কের সঙ্গে অন্য কোনো নির্দিষ্ট ভারের বিক্রিয়কের বিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে 'তুল্যাঙ্ক ভার' (equivalent weight) শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন তাঁর লেখায়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেখা গেছিল একভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে তিনভাগ ওজনের কার্বন, আটভাগ ওজনের অক্সিজেন অথবা ষোলভাগ ওজনের সালফার কিংবা তেইশভাগ ওজনের সোডিয়াম অথবা ৩৫.৫ ভাগ ওজনের ক্লোরিন যুক্ত হয়। সুতরাং বলা যায় ঐ নির্দিষ্ট ভাগ ওজনের কার্বন, অক্সিজেন, সালফার, সোডিয়াম বা ক্লোরিনের বিক্রিয়া করার ক্ষমতা বা যোজন ক্ষমতা একই (same)। সুতরাং ঐ মৌলগুলি যখন নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিক্রিয়া করে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে – তখন ওরা, ঐ ঐ ভাগ ওজন অনুপাতে বা ঐ অনুপাতগুলির সরল গুণিতকের অনুপাতে যুক্ত হবে। খেয়াল করার বিষয় হল এখানে 'ওজন অনুপাত' শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে, যদিও সেইকালে ভর ও ওজনের পার্থক্য জানা ছিল। কিন্তু তুল্যাঙ্ক ভার যেহেতু একই স্থানে পাওয়া দুটি ওজনের অনুপাত, তাই স্থানভেদে এই অনুপাতটি অভিন্নই থাকবে। সে সময় তুল্যাঙ্কভার, যা কিনা দুটি ওজনের অনুপাত – অর্থাৎ একটি সংখ্যামাত্র – এভাবে মৌলগুলিকে চিহ্নিত করণই একমাত্র উপায়ে ছিল। কারণ মৌলের একটি ক্ষুদ্রতম এককের নির্দিষ্ট ভর কিংবা ওজন সম্পর্কে ধারণা করার বিজ্ঞান আবিষ্কার হয় নি। দার্শনিক ধারণায় যেকোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক পরমাণু (atom) থাকলেও তাকে চিহ্নিতকরণ সম্ভব ছিল না।

শুধুমাত্র মৌলগুলির তুল্যাঙ্কভার নির্ণয় নয়, অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়াগুলিকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পরে বোঝা গেছিল অনেকগুলো মৌলের একত্রিত রূপ যাকে মূলক বা radical বলা হয়, সেগুলোও এক একটা মৌলের মত অভিন্নধর্মী। এদেরও তুল্যাঙ্কভার নির্ণয় করা হয়েছিল একইভাবে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ প্রাউস্ট প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত Law of definite proportion বা নির্দিষ্ট অনুপাতের সূত্র। এই সূত্র অনুসারে প্রতিটি যৌগে থাকা মৌলগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে। তাঁর এই সূত্রটি ডেমোক্রিটাসের পরমাণু ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কারণ যদি কোনো বিক্রিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে না হয়ে সামান্য পরিমাণের তারতম্য হয় তবে রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে বলা যায় পরমাণুও ভাঙা যাবে।

জোসেফ প্রাউস্টের পরে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা হয়েছিল অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর। এই আবিষ্কারগুলির সঙ্গে সরাসরি রসায়ন বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় নি তখনো পর্যন্ত। কিন্তু এই আবিষ্কারগুলোর পরই রসায়ন বিজ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হল। এর প্রথমটি হল মার্কিন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সম্পর্কিত ধারণা। তাঁর মতে কোনো পরিবাহীতে তড়িৎগ্রস্ত প্রবাহী বা electric fluid থাকে। যখন কোনো পদার্থে এই প্রবাহীর পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত থাকে তখন তার থেকে তড়িৎ আধান বা ইলেকট্রিক চার্জ নির্গত হয়। যদি কোনো পদার্থে এই তড়িৎ প্রবাহী মাত্রারিক্ত কম থাকে, তখন তা অন্য পদার্থের অতিরিক্ত প্রবাহী গ্রহণ করে। ফ্র্যাঙ্কলিনের মতে কাঁচে আছে সাধারণ অবস্থা থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে ইলেকট্রিক ফ্লুইড। তাই তিনি বললেন যে ঐ পদার্থে (অর্থাৎ কাঁচে) আছে পজিটিভ চার্জ বা ধনাত্মক আধান। তিনি রেজিনে এই ইলেকট্রিক ফ্লুইড কম আছে বলে ধারণা করেন, তাই রেজিনে আছে নেগেটিভ চার্জ। ইলেকট্রন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এটাই ছিল তড়িৎ প্রবাহ সম্পর্কে সর্বজনীন গ্রাহ্য ধারণা। প্রকৃতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের অনেক ঘটনা মানুষের কাছে থাকলেও তড়িৎ কোষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন আবিষ্কৃত হওয়ার পরই তড়িৎ শক্তির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্পর্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় পদার্থ বিজ্ঞানী আলেকসান্দ্রো ভোল্টা একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে এক জোড়া করে তড়িৎদ্বার ও তাদের পরিবাহী তার দিয়ে সংযুক্ত করে এক একটি তড়িৎকোষ তৈরি করেন (তড়িৎ কোষ বা

ইলেকট্রিক সেল হল তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের এক একটা ক্ষুদ্রতম ইউনিট)। তেমনি তিনি এক একটা তড়িৎ কোষকে পরপর সংযুক্ত করে বানালেন ব্যাটারি (ব্যাটারি হল অনেকগুলো তড়িৎ কোষের সমন্বিতরূপ)। এই ঘটনায় যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হল তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের (যেমন ধাতব লবণের) তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে। এই তড়িৎ বিশ্লেষণকে তখনকার ইলেকট্রিক চার্জের ধারণা দিয়েই করা হয়েছিল। ইলেকট্রনের প্রবাহ দিয়ে নয়। পরবর্তীকালে দেখা গেল পজিটিভ চার্জ যে অভিমুখে নেগেটিভ চার্জের দিকে যায় বলে ধারণা করা হয়েছিল তড়িৎকোষ বা ব্যাটারিতে, ইলেকট্রনের প্রবাহ হচ্ছে তার বিপরীত অভিমুখে। এই ঘটনার একটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তা হল ইলেকট্রন আবিষ্কারের আগে এই মানব ধারণা ছিল (ফ্র্যাঙ্কলিনের ইলেকট্রিক ফ্লুইডের প্রবাহের ধারণা) **'ঐতিহাসিক ভুল'**।

ভোল্টার তড়িৎকোষ আবিষ্কারের পর বিক্রিয়াজাত ও বিক্রিয়ক পদার্থের সঠিক আয়তন মাপা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলতে চাই, এই ঘটনার পর রসায়ন বিজ্ঞান আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও পরমাণুর ওজন যেভাবে মাপা হল, পরে অণুর ওজন যেভাবে মাপা হল, তাকে নির্দিষ্ট কোনো কিছুর পরিমাপ বলা যাবে না, তাও তুল্যাঙ্কভারের মতো একটি অনুপাত মাত্র। তাপশক্তির দ্বারা রাসায়নিক বিশ্লেষণ জানা ছিল, কিন্তু তড়িৎ শক্তি দিয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব কিনা জানা ছিল না। ভোল্টার তড়িৎকোষে উল্টো ঘটনা হল, রাসায়নিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণ থেকে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হল।

ভোল্টার কোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তি কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য রাসায়নিক পদার্থের রাসায়নিক বিয়োজনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। তখনকার ধারণায় রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যকার মৌলগুলির স্থানান্তর ঘটাতে খরচ হওয়া শক্তি, যাকে এককথায় রাসায়নিক শক্তি বলছি, তাই তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাসায়নিক শক্তি যেমন তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, তেমনি তড়িৎ শক্তিকে কি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হবে? – অবধারিতভাবে এই প্রশ্ন মানব মনে এসে গেছিল। তাই বিজ্ঞানীরা এই বিষয় অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। অবশেষে এই অনুসন্ধানের ফল পেলেন দুই বিজ্ঞানী নিকলসন এবং কারলিসলে। এঁরা জলের অণুর বিয়োজন ঘটালেন। এই বিয়োজন বিক্রিয়া আগেকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ নয়। তড়িৎ শক্তি প্রয়োগ করে এই বিশ্লেষণ ঘটানো হয়েছিল। এর নাম দেওয়া হল তড়িৎ বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলিসিস। নিকলসন এবং কারলিসলে এই পরীক্ষা করেছিলেন ভোল্টার পরীক্ষার প্রথম প্রকাশ্য উপস্থাপনার মাত্র ছয় সপ্তাহ পরই। অনেক আগে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিশ একটি জ্বলনশীল গ্যাস (হাইড্রোজেন) কে আরেকটি জ্বলতে সাহায্যকারী, অথচ জ্বলনশীল নয় গ্যাসের (অক্সিজেনের) উপস্থিতিতে দহন করেছিলেন। পেয়েছিলেন জলীয় বাষ্প। কিন্তু বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের পরিমাণের নির্ভুল হিসাব তখন রাখা হোত না (ল্যাডয়সিয়ের আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের বই তখনো প্রকাশিত হয় নি)। কিন্তু এবার ঐ জলীয় বাষ্পের তরল অবস্থা অর্থাৎ জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল একটি তড়িৎদ্বারে প্রাপ্ত অক্সিজেনের আয়তনের দ্বিগুণ আয়তনের হাইড্রোজেন পাওয়া যায় অন্য তড়িৎদ্বারে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পেতে আমাদের আরো আট বছর অপেক্ষা করতে হল। (ক্রমশ)

সমীক্ষা ঃ

সমীক্ষার শিক্ষা

চোখ বন্ধ করে রাখলে যেমন কিছুই দেখা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষের সাথে না মিশলে অনেক কিছু শেখা যায় না। শেখার উদ্দেশ্যেই আমরা বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিট মানুষের সাথে (প্রধানত নিম্নবিত্ত অংশের সাথে) সমাজে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে মত বিনিময় করি। আর এই পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উঠে আসে অনেক না জানা কথা, যা আমাদের নতুন করে ভাবতে প্রেরণা যোগায়। আরও বেশি করে মানুষের কথা শুনতে আগ্রহী করে তোলে।

মানুষের মধ্যে আমাদের বক্তব্য হাজির করার জন্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অঞ্চলের জনবহুল জায়গাতে পোস্টার লাগানো আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম। সেই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে একদিন আমরা এনসিইআরটি-এর দশম শ্রেণীর সিলেবাস থেকে বিবর্তনবাদকে মুছে ফেলে বৈজ্ঞানিক মতবাদের বদলে ভাববাদকে প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আর অন্য একদিন ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পোস্টার লাগাচ্ছিলাম। পোস্টার লাগানোর পাশাপাশি আমরা সেই বিষয় সম্পর্কে মানুষের মতামত শোনার চেষ্টা করছিলাম। দুইদিন দুটি রিক্সা স্ট্যান্ডের রিক্সাশ্রমিক ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের পেশার বর্তমান অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, জীবন যন্ত্রণার কথা শুনলাম। বর্তমান অবস্থার কারণ কী এবং দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী সেই সম্পর্কেও মত বিনিময় করলাম। ওনারা স্পষ্টভাবে জানালেন যে করোনা পরবর্তীকালে ওনাদের আয় অনেক কমে গেছে। কারণ হিসেবে বললেন, অনেক মানুষের আয় কমে গেছে তাই তারা প্রয়োজনে আগে রিক্সায় উঠলেও এখন আর ওঠেন না। আবার অনেকে বাইক বা স্কুটি কিনে নিয়েছেন তাই তাদের আর রিক্সার প্রয়োজন হচ্ছে না। আরেকটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করলেন সেটা হল

অনলাইন বাইক বুকিং। সেই কারণেও যাত্রী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। চা পান সহযোগে আলোচনা যখন জমে উঠল তখন একজন শ্রমিক ভাই প্রশ্ন করলেন, আপনারা কিসের পোস্টার মারছেন? আমরা ঘটনাটা বললাম। বিবর্তনের বিষয় ওনাদের স্বাভাবিকভাবেই অজানা তাই বিষয়টা জানতে চাইলেন। আমরা খুব সহজ সরলভাবে বোঝালাম যে চার্লস ডারউইন বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে বেঁচে থাকতে থাকতে বন মানুষের এক প্রজাতি (প্রাইমেট) থেকে কিভাবে ক্রমে ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হল।

যে সময় উচ্চশিক্ষিত এমনকি বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করা অধিকাংশ ব্যক্তিরাও মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করেন তখন আর্থসামাজিক কারণে লেখাপড়ার সুযোগ না পাওয়া, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া গরীব মানুষগুলো যারা ভাগ্যের কাছে, অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন তাঁদের কাছ থেকে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা আসা কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু আমরা যা ভাবি সেটাও যে সবসময় সত্যি তা নয়। আমাদের আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে রিক্সা শ্রমিক ভাইয়েরা বলে উঠলেন, কিন্তু সরকার এটা করল কেন? আমরা জানতে চাইলাম কেন করতে পারে বলে আপনাদের মনে হয়? ওনারা বললেন, সরকার মনে হয় চায় না মানুষ সত্যিটা জানুক। আপনারা এর প্রতিবাদ করে ভালো কাজ করছেন। অন্য স্ট্যান্ডের এক শ্রমিক ভাই বললেন, আপনাদের দাবি দাওয়া সঠিক। আমার সমর্থন আছে। শিক্ষার তো খুবই খারাপ অবস্থা। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেন প্রতিবাদের ইচ্ছে হারিয়ে গেছে।

একজন আইসক্রিম বিক্রেতা মন দিয়ে পোস্টারের বয়ানগুলো পড়ছিলেন। জীবন ও সমাজ সম্পর্কে ওনার মতামত জানতে চাইলে উনি বললেন, কোভিড পরবর্তী সময় আয় প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ওনার কাছেও কারণ জানতে চাইলাম। উনি বললেন, দেখুন করোনার সময় অনেকের চাকরি চলে গেছে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। তাই অনেকে আইসক্রিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন আবার অনেকে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। আইসক্রিম তো মানুষ পেট ভরাতে খান না, শখে খান। সব খরচ সামলে তারপর যদি কিছু বাঁচে তবেই তো খাবেন, নাহলে খাবেন কেন? কথা চলতে চলতে উনি বললেন মানুষের খুবই শোচনীয় অবস্থা – রোদনে ভরা বসন্ত।

শিক্ষা, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, কাজের জায়গা থেকে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়। শাসকশ্রেণীও মগজ ধোলাইয়ের জন্য সদা সচেষ্ট। তার মধ্যেও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে চিন্তা গড়ে ওঠে সেটা যে অনেকাংশেই বাস্তবসম্মত সেটা অনুধাবন করা যায় একমাত্র যোগাযোগ এবং মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।

মানুষের মাঝে যাওয়া বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। পথের সাথীর থেকে শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়েই সংগ্রহ করে নিতে হয় আগামী দিনের পথ চলার রসদ। এটাই আমাদের সমীক্ষার শিক্ষা।■

সংগঠন সংবাদ

'পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান' বিষয়ক ওয়ার্কশপ

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল কর্মীবাহিনীকে একত্রিত করে আমরা দুটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছিলাম। একটি সোনারপুর এলাকায়, অপরটি পুরুলিয়া শহরে।

দুটি ওয়ার্কশপে আমাদের কর্মীবাহিনীদের কাছে পরিবেশবাদ কি? পরিবেশ বিজ্ঞান কি? উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য কি? – এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপনা করা হয়। এই বিষয় সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্ন উপস্থিত কর্মীদের থেকে উঠে আসে। প্রেসিডিয়ামের পক্ষ থেকে একে একে সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া হয়। পুরো আলোচনাটা চলে পারস্পরিক ক্রমাগত প্রশ্ন-উত্তর আবার প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়ার মতো প্রক্রিয়ায়। আলোচনায় জলসংকট, গাছ লাগানো-গাছ কাটার মত বিষয়, জলাভূমি বোজানোর মতো বিষয়, কার্বন ট্রেডিং, প্লাস্টিক ও তার ব্যবহার-এর মতো বিষয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় প্রেসিডিয়াম থেকে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের মুখ্য কারণ প্রাকৃতিক, মানুষের ভূমিকা সেখানে কি, – এই বিষয়ে আলাদা করে আলোচনা হয়।

বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটের পক্ষ থেকে 'পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান' বিষয় সেমিনার

বেহালা-ঠাকুরপুকুর ইউনিট নিজ উদ্যোগে একটি কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই বিষয়ে সেমিনার করে। পরিবেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কিশোর বয়স থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমের মাধ্যমে মনের গভীরে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু আলোচনা সভায় যখন বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রাকৃতিক কারণগুলি উপস্থাপকরা তুলে ধরলেন, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করা হল, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার স্বপক্ষে প্রমাণাদি হাজির হওয়ার হল তখন সকলের সন্দেহ কাটে। সভার শেষে এমন বক্তব্য উঠে এসেছে – 'আমরা কি তবে এতদিন ভুল শিখেছি?'

এই সেমিনার কি পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রভাব ফেলেছে, তা বোঝা গেছে এই ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ দিবস প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধগুলি তারা সংগঠনের কাছে জমা দিয়েছে।

পুরুলিয়াতে পাঠকদের নিয়ে আলোচনা সভা

পুরুলিয়া শহরে জেলার পাঠকদের একত্রিত করে স্থানীয়

নীলকুঠিডাঙ্গা ক্লাবে একটি পাঠক সম্মিলন হয় বিগত বছরের মতো। এখানে ভারতে স্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং জনতার অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিটি বিষয়ে দুজন করে কর্মী বক্তব্য রাখেন (মোট চারজন বক্তা)। তারপর উপস্থিত পাঠকদের কাছে পুরো আলোচনার সারাংশ তুলে ধরা হয় সভাপতি মন্ডলীর পক্ষ থেকে। তারপর হয় পাঠক-দর্শকদের বক্তব্য রাখার পর্ব। এখানে দ্বান্দ্বিক উপায়ে ইতিমধ্যে উঠে আসা বক্তব্য থেকে দর্শকরা দিশা খুঁজে পান এবং অতিরিক্ত সংযোজন, অঙ্গীকার, আহ্বান উঠে আসে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের জন্য। অনেক নতুন পাঠক সদস্যতা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যে প্রচার কর্মসূচী

বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে আমরা ঘোষণা করেছিলাম এমন একটা দিন হিসেবে, যেদিন ‘আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপন আর সেল্ফি তুলে’ নয় এই দিনটাতে ‘আমরা সকলের জন্য খাদ্য-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা-রোজগার প্রদানের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পথে নামুন’ – এই ডাক দেওয়া হবে। আমরা সাধ্যমতো রাজ্য জুড়ে পোস্টারিং কর্মসূচী, লিফলেটিং ও পথসভা, র‍্যালি, পোস্টার প্রদর্শনি, অডিও রেকডিং করে প্রচার এবং ঘরোয়া আলোচনা সভা করেছি। প্রচার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলা, তাঁদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ ইত্যাদি চলেছে অবিরত।

আমাদের লিফলেটে লেখা ছিল –

‘মানুষের পরিবেশ হল মানুষকে কেন্দ্র ক’রে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষ যদি সুস্থ-নির্মল এবং তার জীবনের বিকাশের উপযোগী পরিবেশ পায় তবেই তো চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুন্দর করায় ভূমিকা নিতে পারে।’

এই ছিল পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকোণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস আমরা সাধ্যমতো পালন করেছি। আমরা অঙ্গীকার করেছি যে এই দাবি শুধু একটা দিনের দাবি নয়, এই প্রচার-মতামত সংগ্রহ, সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী আমরা আগামী দিনেও অবিরত রাখবো।

এবারের পরিবেশ দিবসে গোচরণ ইউনিট যেমন সৃজনশীল পোস্টার প্রদর্শনী করে চমকে দিয়েছে, তেমনি লিফলেটের বক্তব্যকে অডিও টেপ করে ব্যাপক সামাজিক নেটওয়ার্কে প্রচারও ছিল লক্ষ্মীকান্তপুর ইউনিটের অভিনবত্ব। সোনারপুর ইউনিট এই দিনে মঞ্চ করে জনবহুল স্টেশন চত্তরে বক্তব্য রেখেছে। সেখানে পরিবেশ বিষয়ে সম মতাবলম্বী অন্য সংগঠনকে দেখা গেছে। একই জিনিস দেখা গেছে পুরুলিয়াতে এবং বেহালা ঠাকুরপুকুরে। অন্যান্য ইউনিটগুলি যেমন উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, বনগাঁ, হাওড়া-আমতা ইউনিটে, পাথর প্রতিমা ব্লকের এক বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রচার হয়েছে। ঐ দিন ওরিয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের সামনে স্থানীয় ক্লাব সদস্য, স্থানীয় গ্রামবাসীদের একত্রিত করে প্রায় সত্তর জনের উপস্থিতিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। রাজ্যের বহু অঞ্চলে পোস্টারিং, লিফলেটিং, আলোচনা সভা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের উৎসাহী সদস্যরা একত্রে প্রচার কর্মসূচী নিয়েছেন। পুরুলিয়া শহর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর ব্লক এবং কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে মিছিল সহযোগে পথসভা হয়েছে।

আসানসোল ঃ ৫ই জুন আসানসোল বিধান চন্দ্র কলেজের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত রূপে বিজ্ঞান মনস্ক’র স্থানীয় শাখার তরফ থেকে সংগঠনের বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়। মুখপত্র ‘সমীক্ষণ’ এর প্রদর্শনী থেকে উপস্থিত অধ্যাপক ও অংশগ্রহণকারীরা পত্রিকার বিভিন্ন ইস্যু উৎসাহভরে সংগ্রহ করে।

সিলেবাসে ডারউইনবাদ বাদ প্রসঙ্গে কর্মসূচী

সিলেবাসে ডারউইনবাদ সহ মৌলিক কতগুলি বিষয় এনসিইআরটি দশমশ্রেণীর পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়েছে। তার প্রতিবাদে সারা দেশে বিজ্ঞানীমহল প্রতিবাদ করেছেন, বিজ্ঞান জার্নাল ‘নেচার’ এর প্রতিবাদে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। আমরাও পোস্টারিং কর্মসূচী নিয়েছিলাম। ফেসবুকের দেওয়ালেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আমরা এনসিইআরটি’র কাছে গত ৪ঠা মে একটি প্রতিবাদ পত্র জমা দিয়েছি।

মে দিবসে বিজ্ঞান মনস্ক

বস্তুর বিকাশ-ক্রমপরিবর্তনের নিয়মই বিজ্ঞান। সেকারণে এই মহাবিশ্ব বস্তুর সমাহার নয়, বস্তুজগতের অবিরত প্রক্রিয়ায় সমাহার। মানব সমাজ তার অংশ। সেই মানব সমাজের ক্রমপরিবর্তন বা বিবর্তনের নিয়মে আছে কিছু বিশেষত্ব। তা হল তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশ। এই বিকাশ ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে সমাজ বিকাশ ঘটায় (ইচ্ছাও কিন্তু বস্তুজগতের প্রক্রিয়া)। এই বিকাশের ধারায় আমরা পুঁজিবাদী সমাজে এসে পৌঁছেছি। এই সমাজে বিদ্যমান সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীরা যখন তাঁদের বাঁচার পরিবেশকে সুস্থ করার জন্য দাবি করলো, তখন তাঁরা বাধার সম্মুখীন হল। ‘পুঁজিবাদের মক্কা’ ইংলন্ডে দশঘন্টার কাজের দিবস, ন্যায্য মজুরির দাবি ইত্যাদির জন্য অসংখ্য আন্দোলন হয়েছে। কেবলমাত্র মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিশ্রেণী উৎপাদনের প্রায় সকলক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে আধুনিক যুগে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হয়েছে। কিন্তু এই একতার মাঝে বিরোধও আছে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে। এমন অবস্থায় শিকাগোর হে মার্কেটের লড়াই ছিল ঐক্যবদ্ধ মালিকশ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই। তাই বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ বিকাশের নিয়মকে এখানে খুঁজে পায়।

‘মে দিবস উদ্‌যাপন কমিটি’র অংশ হিসেবে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ এবছর দক্ষিণ ২৪ পরগণার আশুতি অঞ্চলে একটি স্কুল প্রাঙ্গনে মে দিবস পালন করেছে। খেটে খাওয়া বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবীরা তাঁদের জীবন যন্ত্রণা, মুক্তির উপায় খুঁজতে মতামত প্রকাশ করেন। এঁদের মূল্যবান বক্তব্যে বিজ্ঞানমনস্ক অনেক শিক্ষা লাভ করেছে। বিজ্ঞান মনস্ক এখানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে এবং শ্রমজীবীদের বক্তব্য শুনে সমৃদ্ধ হয়েছে।■

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতে অগ্রগতি

[বিগত সংখ্যায় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রথম অংশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্র এবং নাগরিক পরিসেবা ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলেছে, তা তুলে ধরা হল। – সম্পাদক]

পঞ্চম বক্তা (ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতি) ঃ ইউরোপীয়দের আগমনকালে ভারতে বাস্তবত কোন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। ছিল অভিজ্ঞতাবাদ আধারিত প্রাচীন নানা চিকিৎসা প্রণালী। দেশের মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কোন খতিয়ানও ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালেই ভারতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা হয় প্রাচীনপন্থীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় এবং তারপর চেন্নাইতে। যদিও তখন আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ মিলতো শুধুমাত্র ইউরোপীয় জনতার এবং দেশী রাজা-মহারাজা-ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে কিছুমাত্রায় আধুনিক চিকিৎসা শুরু হয়। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা না থাকার কারণে এক একটা মহামারি গ্রামকে গ্রাম উজার করে দিত।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এসে দেখা যায় যে ভারতে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা হয় মাত্র ২৮টি। এরপর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। রোগ প্রতিরোধ করার জন্য শিশু এবং অন্যদের টীকাকরণ এদেশে শুরু হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্মল পক্স প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, যদিও তা ব্যাপক দেশবাসীর মধ্যে তখনও করা হয়নি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রথমত পোলিও এবং স্মলপক্স নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক জনতার মধ্যে টীকাকরণ শুরু হয় এবং তারপর অন্যান্য সকল রোগের জন্যও। আজ দেশ পোলিও মুক্ত, স্মল পক্স বা গুটি বসন্ত মুক্ত।

একটি দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি বোঝা যায় সে দেশের গড় সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বা Life expectancy কত বাড়ল তার উপর। এই গড় সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল নির্ভর করে শিশু মৃত্যুর হার, প্রসবজনিত বা অন্য কারণে নারীদের মৃত্যু, ভ্রূণহত্যা, পুষ্টি, চিকিৎসা পরিসেবা, বেঁচে থাকার পরিবেশ, পারিবারিক গড় আয় ইত্যাদির উপর। এইসব কিছুর ফলশ্রুতিতে Life expectancy বৃদ্ধি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতা প্রমাণ করে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মানুষের গড় সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৩৫.২১ বছর, যা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে হয়েছে ৭০.৪২ বছর। এর বড় কারণ হল শিশু মৃত্যুর হার কমে যাওয়া। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০-এ ১৪৫.৬, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এসে এই শিশুমৃত্যুর হার হয়েছে প্রতি ১০০০ শিশুর ক্ষেত্রে মাত্র ২৬.৬৯৫। এই পর্যায়ে দেশে মেডিকেল কলেজ ১৯৫০-এর ২৮টি থেকে প্রায় ২০ গুণ বেড়ে হয়েছে ৬৫০টি (তার মধ্যে ৩৫৫টি সরকারি বা অর্ধ সরকারি)। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দেশে কার্যত কোন নার্সিং কলেজ ছিল না। বর্তমানে দেশে ৮০০টিরও অধিক নার্সিং কলেজ গড়ে উঠেছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দেশে মাত্র কয়েক হাজার অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার ছিল আর বর্তমানে তার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৮ হাজার। এখন গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলাসদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, অসংখ্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে এদেশে। বর্তমানে মেডিকেল সায়েন্স অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে যে যে রোগ সারাতে সক্ষম তার সমস্ত ব্যবস্থাই এদেশে বর্তমান। সুতরাং চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে দেশে বিরাট সাফল্য এসেছে।

ষষ্ঠ বক্তা (ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রগতি) ঃ আমার আগের বক্তা যে তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন তাকে খন্ডন করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। কারণ এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রূপায়ণ প্রশ্নে তাঁর বক্তব্যে সাফল্যের খতিয়ান রাখতে গিয়ে বহুকিছু অনুচ্চারিত রয়ে গেছে যা আলোচনায় না আনলে আমরা সঠিক সত্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হব।

WHO-র recommendation হল কোন দেশে উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন প্রতি ৬০০ জন নাগরিক পিছু একজন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা শিক্ষিত অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। আমাদের দেশের হিসাব কি? ভারতে সরকারি মতে প্রতি ১৫১১ জন মানুষ পিছু একজন ডাক্তার।

WHO-র recommendation হল প্রতি ১০০০ জন মানুষ পিছু ২.৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী। ভারতে এই সংখ্যা প্রতি হাজারে এখনও ১ জনও নেই।

শুধুমাত্র এটুকু তথ্যই স্বাস্থ্যের হাল বোঝার জন্য যথেষ্ট না। কারণ এই পাশ করা ডাক্তার প্রশিক্ষিত নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর বড় অংশই নিযুক্ত আছেন মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় বড় শহরের হাসপাতালে। তারও আবার সংখ্যাধিক্য অংশ বর্তমানে

নিযুক্ত আছেন নামী-দামী বেসরকারি হাসপাতালে। দেশের আপামর শ্রমিক-কৃষক এঁদের নাগাল পাবেন কিভাবে?

গড় সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল বা Life Expectancy-র যে হিসাব পেশ করা হয়েছে তা সমগ্র দেশবাসীর গড়। কিন্তু দেশের ৭০ শতাংশ গরীব শ্রমজীবী জনতার ক্ষেত্রে এটা ৭০.৪২ বছর নয়, অনেক কম। কারণ তারা বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত, তাঁদের বাসস্থান বিজ্ঞানসম্মত নয়, তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সুযোগ পান না। এখনও দেশে ২২ শতাংশ মহিলা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পরিবারের কারণে চিকিৎসাকেন্দ্রে নয় বাড়িতেই প্রসব করেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। ১৪ শতাংশ মহিলা আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রসব থেকে বঞ্চিত হন। এদেশের অধিকাংশ শ্রমিক-কৃষক পুষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান প্রোটিনজাত খাদ্য থেকে বঞ্চিত। পরিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে দেশের অধিকাংশ জনগণ আজও বঞ্চিত। দেশের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে বলে অনেক গরীব মানুষের চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয়।

দেশে আজও গড়ে ৫০ হাজার মানুষ প্রতিবছর সাপের কামড়ে মারা যান। মেডিকেল কলেজের শিক্ষাক্রমে শাপের বিষয় এবং তার চিকিৎসা এখনও অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন গ্রামীণ হাসপাতালে অ্যান্টিভেনাম সিরাম নাই। ইচ্ছা থাকলেও রাত-বিরেতে সময়মত দূরবর্তী সদর বা ব্লক হাসপাতালে পৌঁছানো যায় না। আবার সদর বা ব্লক হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম থাকলেও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা, রক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা নাই বলে আজও এতো মৃত্যু ঘটছে।

সুতরাং চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতির সুযোগ থেকে আজও দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ বঞ্চিত। দেশে একদিকে নামী-দামী বেসরকারী অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠছে যার মালিকরা চিকিৎসার নামে বেলাগাম মুনাফা লুঠছে আর অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় ভীষণ অপ্রতুল সরকারি চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। তাই শ্রমজীবী জনতা কার্যত অসহায়। এই অসহায়তাই তাঁদের কুসংস্কার-ঝাড়ফুঁক, তুকতাক এবং মন্দির-মসজিদে হত্যে দেওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সপ্তম বক্তা (ভারতে নাগরিক পরিসেবা ক্ষেত্রে অগ্রগতি) ঃ নাগরিক পরিসেবা প্রশ্নের আলোচনায় আমরা সড়ক ও নানা যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিসেবা, পানীয় এবং অন্য কাজে ব্যবহার্য জল, স্যানিটেশন, পয়ঃপ্রণালী, বাসস্থান, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মধ্যে আলোচনা সীমিত রাখবো।

ইউরোপীয়রা ভারতে আসার আগে সাধারণ মানুষের জন্য এসব কিছুই ছিল না। তাঁরা পায়ে হেঁটে বা ডিঙ্গি নৌকায় যাতায়াত করতেন। পুকুর বা হ্রদ বা নদীর জলেই প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন, স্নান, পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতেন। সন্ধ্যে হলেই সর্বত্র অন্ধকার নেমে আসত, মুষ্টিমেয় সামর্থ্যবান মানুষ প্রদীপ জ্বালতেন ঘরে, বাসস্থান ছিল পর্ণকুটীর। ইউরোপীয়রা এদেশে আসার পর প্রথমে নিজেদের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহনের জন্য পুরানো সড়কগুলি মেরামতি করে, জলপথই ব্যবহার করতো তারা বেশি। ইংরেজদের হাত ধরে এদেশে প্রথম রেলপথ তৈরি হয় প্রথমত পণ্য পরিবহনের জন্য। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে থেকে থানে অবধি ২১ মাইল দীর্ঘ রেল চালু হল যাত্রী পরিবহনের জন্য। তারপর সারাদেশে ধীরে ধীরে রেলপথের বিস্তার হয় বর্তমানে ভারতে রেলপথে রুটের দৈর্ঘ্য ৬৭ হাজার ৩৬৮ কি.মি, যা পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘতম।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে প্রথম বিমান পরিবহন শুরু হলেও সাধারণ যাত্রীদের নিয়ে বিমান পরিবহন অনেক পরে শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ৭টি ঘরোয়া বা domestic বিমান এয়ারলাইন্স আছে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই পরিবহনের বন্দোবস্তো হয়েছে। মধ্যবিত্ত থেকে শ্রমজীবী মানুষও প্রয়োজনে এই সুবিধা ভোগ করেন।

আগেই বলা হয়েছে ইংরেজরা এদেশে সড়ক পরিবহনে তেমন কোন গুরুত্ব দেয় নি। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে হাইওয়ে অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর ৬৬-৬৭ বছরে দেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কার্যত বিপ্লব এনেছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যেখানে দেশে সড়কপথ ছিল মাত্র ৬৫ হাজার কি.মি সেখানে ২০২২-এ এসে প্রায় ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৩.৭৩ লক্ষ কি.মি। দেশে বর্তমানে ৫৯৯টি জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৩৪ কি. মি, রাজ্য সড়ক ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯০৮ কি.মি। এখন দেশের প্রতিটি গ্রামগঞ্জে গেলেও হয় ঢালাই রাস্তা নয়ত বিটুমেনের (পীচের) রাস্তা দেখা যাবে।

দেশে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সূচনা হয় ৫ই অগাস্ট ১৯০৫, বেঙ্গালুরু শহরে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মাত্র ১৭১৩ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত সারা দেশে ২০২২-এ এসে তা হয়েছে ৪২ হাজার কোটি মেগা ওয়াট অর্থাৎ কুড়ি কোটি গুণ! এই বিদ্যুৎ শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমন নয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এসে দেশের ৯৭.৩১ শতাংশ মানুষ বৈদ্যুতিক সুবিধার আওতায় এসেছেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দেশের ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার গ্রাম অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়েছে। সুতরাং এই অগ্রসরতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মহান আশীর্বাদ হিসেবে মানুষ দেখেন।

বর্তমানে দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষ নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। কাঁচা এবং অর্ধকাঁচা বাড়িগুলি পাকা করার সুদীর্ঘ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুসারে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এসে দেশের ৬৮.১ শতাংশ পরিবার সুনির্মিত নিজস্ব টয়লেট ব্যবহার করেন, ১০.১% পরিবার যৌথভাবে অন্যের সাথে টয়লেট ব্যবহার করেন।

দেশের ৯৬ শতাংশ শহরের পরিবার এবং ৮৫ শতাংশ গ্রামের পরিবারকে প্রাথমিকভাবে পরিশুদ্ধ পানীয় এবং অন্য কাজে

ব্যবহারের জল পৌঁছে দেওয়া গেছে আর এই সকল বিষয়ই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, বিশেষত বিগত ৩ দশকে দ্রুততার সাথে বিকাশ হয়েছে।

আর অত্যাধুনিক পরিসেবা ক্ষেত্রের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এদেশে বর্তমানে মানুষের হাতে ২২০ কোটি মোবাইল সেট (জনসংখ্যার তুলনায় বেশি) আছে এবং ৬২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ সক্রিয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। সুতরাং নাগরিক পরিসেবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল রূপায়ণে দেশের বিরাট অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশ থেকে এদেশ প্রায় কোন অংশেই পিছিয়ে নেই।

অষ্টম বক্তা (ভারতে নাগরিক পরিসেবা ক্ষেত্রে অগ্রগতি) ঃ আমার পূর্বের আলোচক অনেক তথ্য নিয়ে নাগরিক পরিসেবায় অগ্রগতির কথা তুলে ধরলেন। একে খন্ডন করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। আমার বক্তব্য হল বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রগতির তথ্য থেকে সামগ্রিক অবস্থার উপলব্ধি হয় না। সমাজ বিকাশের ধারায় তাকে বিচার করতে হবে। ইউরোপীয়দের আগমনের আগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানত পরিভোগের জন্য উৎপাদনে নাগরিক পরিবেসা সীমিত ছিল কারণ দেশের ব্যাপক অংশের গ্রামীণ শ্রমজীবী জনতা তখন নাগরিকের সংজ্ঞাতেও পড়তেন না। সামন্তব্যবস্থার গর্ভে বাজারের লক্ষ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনার ফলে বাজারের জন্য, পণ্য সঞ্চালনের জন্য এই পরিসেবার ধীরে ধীরে বিস্তৃতি ঘটে। ইউরোপীয়দের এদেশে আগমন এবং বিশেষতঃ ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পর এদেশেও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচলন শুরু হল তার সীমিত প্রয়োজনে। শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সড়ক, রেলপথ নির্মাণ, যানবাহনের প্রচলন হল। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে যা মাদ্রাজের রেড হিল থেকে চিন্তাদ্রিপেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যায়ে এই রেলপথ চালু হয় গ্রানাইট সরবরাহের জন্য, মানুষ নয়। এর প্রায় ২৬ বছর পর অর্থাৎ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যাত্রীবাহী রেল চালু হয়। তাই এই ধারাকে পণ্য অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

একথা সত্য যে ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তীতে এবং বিশেষতঃ বিগত তিন দশকে নাগরিক পরিসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির নিয়মে এগুলি আর রাষ্ট্রের দেয় পরিসেবা হিসেবে নেই। সবই এখন পণ্য। অর্থাৎ বাজারে সবই পাওয়া যায়, আপনার ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে তা ক্রয় করে পুঁজির মালিকশ্রেণীর মুনাফা বাড়িয়ে তুলুন। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে ঢালাই বা পীচের রাস্তা না হলে অটোমোবাইল শিল্প, সিমেন্ট বা ইস্পাত শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব ছিল কি? আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে কৃষি এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সুতরাং পরিসেবা ক্ষেত্রের বিকাশ না হলে এই অর্থনীতিকে টিঁকিয়ে রাখা যাবে না। বর্তমানে তাই পরিসেবা ক্ষেত্রেই সর্বাধিক বিনিয়োগ হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র এবং বিশেষ করে অতীতে পিছিয়ে থাকা দেশগুলিতে। কারণ অবিকশিত অঞ্চলেই এই বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতি বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ বর্তমান। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা যেখানেই যান দেখবেন ঝাঁ চকচকে রাস্তা, ফ্লাইওভার, মোবাইল পরিসেবা, স্কুটার, বাইক এর ছড়াছড়ি। এই পরিসেবা অধিক মাত্রায় এবং বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয়ের জন্য একদিকে রয়েছে লোভনীয় প্রচার এবং অন্যদিকে সরকারি পদক্ষেপ।

এই অগ্রগতির সুযোগ কম-বেশি সাধারণ মানুষও পাচ্ছেন এটা মিথ্যা নয়, কিন্তু এই অগ্রগতির লক্ষ্য মানুষের জীবনের উন্নতি নয়, বিনিয়োগকারীর মুনাফা। এই কারণেই 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে দেশী-বিদেশী কোম্পানিরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। ভূতাত্ত্বিকভাবে বিপজ্জনক অঞ্চলে অবৈজ্ঞানিকভাবে বিরাট বিরাট অবকাঠামো গড়া হচ্ছে। বিপর্যয়ে তা ভেঙে পড়লে পুনর্গঠনের জন্য আবার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। আজকের যুগে সারা পৃথিবীতে উৎপাদিত যে কোন সাধারণ বা বিলাসবহুল পণ্য সকলের হাতের সামনে। বড় বোতলে দামি শ্যাম্পু বিক্রি হবে না তো কি? ১ টাকা বা ২ টাকা পাউচে কিনুন। মোবাইল এবং বিশেষ করে স্মার্ট ফোন না থাকলে একজন দিনমজুর বা গরীব কৃষকেরও দৈনন্দিন কাজে বাধা আসছে। খান, না খান স্মার্ট ফোন চাই। যে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল আছে তাতে যে আশা কর্মীরা যাবতীয় কাজ হাতে কলমে করত সরকারি নিয়ম অনুসারে এখন সবই মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার ক'রে করতে হবে। তার জন্য স্মার্ট ফোন আবশ্যক। সরকার বলেছিল সকল অঙ্গনওয়ারি কর্মীকে স্মার্ট ফোন দেবে কিন্তু বাস্তবে পকেটের পয়সা দিয়ে তা কিনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হচ্ছে নিজেদের পয়সায়। এমনকি ছাত্রছাত্রীদেরও নাচ-গান শিখতে স্মার্ট ফোন কিনতে হচ্ছে। যদিও নাগরিক পরিসেবার অগ্রগতির সুযোগ কম-বেশি সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন কিন্তু এই অগ্রগতির লক্ষ্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে উন্নতি ঘটানো নয়। তাই বিনিয়োগের জন্য তৈরি রাস্তা ভেঙে নতুন করে গড়া হচ্ছে।

কিন্তু মনে রাখবেন সরকারি মতেই দেশের ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ গৃহহীন। ১৯.৪ শতাংশ জনগণের বাড়িতে শৌচালয় নেই, ১০ শতাংশ বস্তির গণ পায়খানা ব্যবহার করেন। দেশের ২০ শতাংশ মানুষ পানীয় বা ব্যবহারে জল পান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরবরাহ করা জল বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রদীপ যতই উঁচুতে থাকে নিচের অন্ধকার ততই প্রসারিত হয়। (ক্রমশ)

ব্যঞ্জনবর্ণের ছড়া

– তন্ময়

ক

কুসংস্কার মানুষকে ভুল পথ চেনায়
কৌতূহলী মন প্রশ্ন করতে শেখায়।

খ

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা
মৌলিক অধিকার, নয় কারও ভিক্ষা।

গ

গান বাঁধো প্রতিবাদের, গলা ছাড়ো জোরে
একসাথে লড়াই করো হাতে হাত ধরে।

ঘ

ঘাম ঝরাও প্রতিদিন, শরীরচর্চা রোজ
হাঁটা, সাঁতার, ব্যায়ামে সুঠাম দেহের খোঁজ।

ঙ

আ**ঙু**লের নখে নোংরা জমে হাত কিংবা পায়ে
রোগজীবাণু থেকে বাঁচতে পরিস্কার রাখতে হয়।

চ

চোখ কান খোলা রেখে পাশাপাশি চল সবে
চারিপাশের বিপদের মোকাবিলা সহজ হবে।

ছ

ছয় সাত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন অতি
সতেজ থাকে শরীর মন, কাজে বাড়ে গতি।

জ

জল খেলে পরিমানে সবার উপকার
জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড কর পরিহার।

ঝ

ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত অবিরাম হলে
বিপদে সজাগ থাকো সকলে মিলে।

ঞ

ঝ**ঞ্ঝা** আসুক যতই, লড়াই ছাড়ব না
মানুষে মানুষে বিভেদ, বঞ্চনা সইব না।

ট

টিকটিকি ডাকলে ঠিক, একথার নেই কোনো মানে
ঘটনা বিচার করে সত্য খুঁজে নাও বিজ্ঞানে।

ঠ

ঠিকুজিকোষ্ঠী বিচারের নেই কোনও মানে
গ্রহের ফের হয়না কিছুই কারও জীবনে।

ড

ডিম, মাছ, মাংস, শাকসবজি খাও
প্রোটিনের অভাব পূরণ করে নাও।

ঢ

ঢাকঢাক গুড়গুড় করে যারা জেনে নাও
মুখ ঢাকে মুখোশে, একটানে খুলে দাও।

ণ

গ্রহ**ণে**র সময় খেলে হয় যে অকল্যাণ
একথা সত্য নয়, মিথ্যার নির্মাণ।

ত

তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ, ওঝাদের ঝাড়ফুঁক
তক্কে তক্কে থেকে ধরে ফেলো বুজরুক।

থ

থমথমে পরিবেশে থতমত খেয়ো না
সাহস রাখ বুকে, লড়াই থামিও না।

দ

দূষণ রুখতে হবে সুস্থ জীবনের জন্য
পরিবেশ বিজ্ঞান করে চলো মান্য।

ধ

ধর্ম, জাতিভেদ মানুষের তৈরী
এসবের অবসানেই কাটবে যে বৈরী।

ন

নজরে পড়ে যদি কারও কোন অপরাধ
সমবেত হয়ে তবে করো তার প্রতিবাদ।

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা
Registration No.: S/IL/SO197407 of 2012-13

পরিবেশ দিবসে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচী

কেন এই অনিশ্চিত জীবন
কনুষিত করছে কারা??

গোচরণ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ভ্রাম্যমান প্রচার

দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে পথসভা

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ
পুরুলিয়া শাখা
VIGYAN MONOSKO
Purulia Unit
Regd. No: S/1L/97407 of 2012-13

পুরুলিয়ায় মিছিল

কলকাতার ঠাকুরপুকুরে পথসভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমায় আলোচনা সভা

বিশ্ব পরিবেশ
৫ ই জুন, ২০২৩
বিজ্ঞান ম
পশ্চিমবঙ্গ
সোনারপুর ইউনিট

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে পথসভা

বিজ্ঞান মনস্ক’র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে
কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com   Website : https://samikshan.com